وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৫ম বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জানুয়ারি ২০২১

Web : www.al-itisam.com

আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আলী (রা.) বললেন, আমি কি তোমাকে সেই বিষয়ের জন্য পাঠাব না, যার জন্য আমাকে রাসূল (ছা.) পাঠিয়েছিলেন? তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘তুমি ছাড়বে না কোনো উঁচু কবর, সব ভেঙ্গে সমান করে দিবে এবং ছাড়বে না কোনো ছবি-মূর্তি, সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯)।

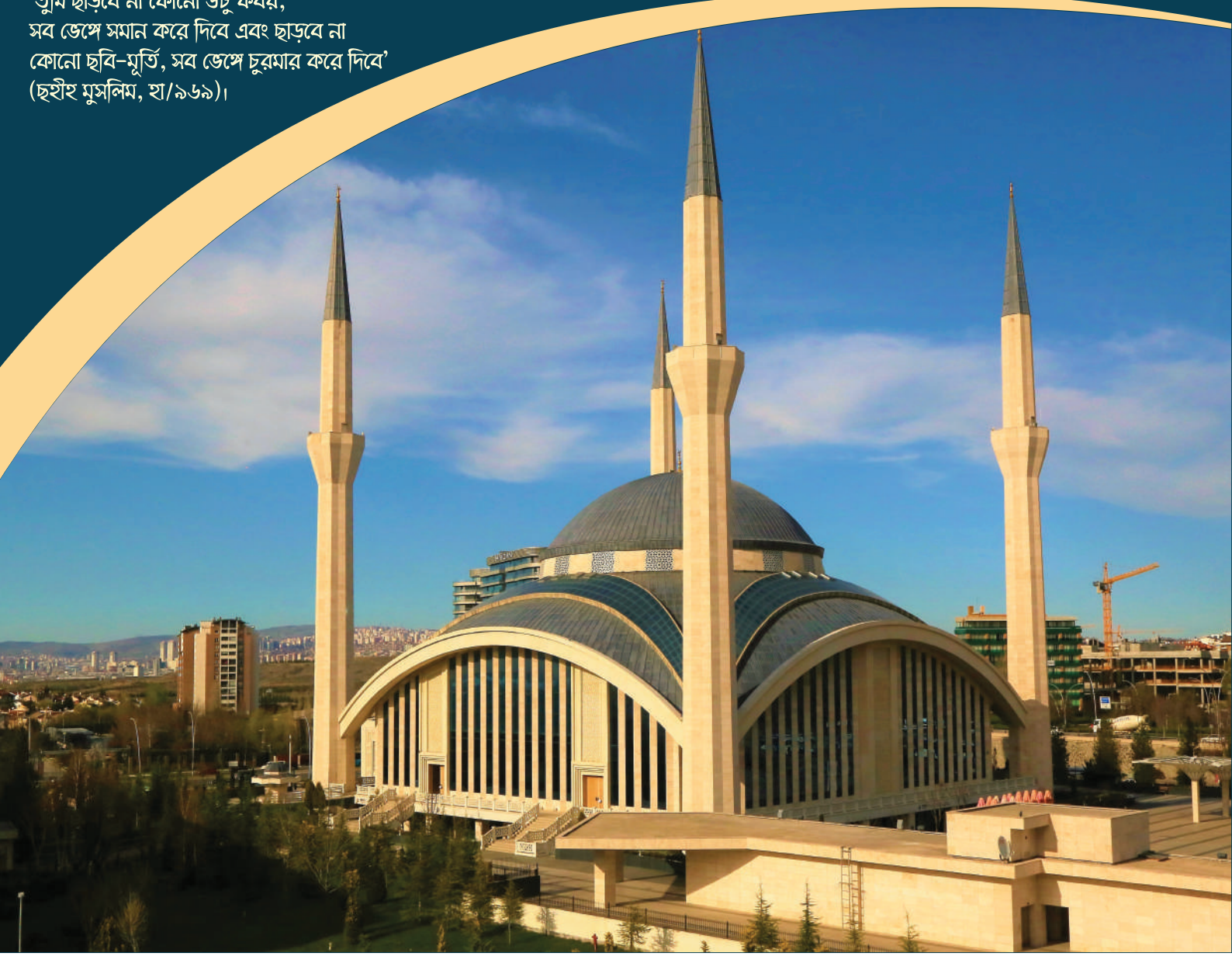

সূচিপত্র

مجلة الاعتصام الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٥، جمادى الأول و جمادى الأخير ١٤٤٢ هـ/ يناير ٢٠٢١ م العدد: ٣، الجزء: ٥١
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01301-189771, 01750-124030, 01750-124490, E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

আহমেদ হামদি আকসেকি মসজিদ, আঙ্কারা, তুরস্ক। আনাতোলিয়ার সেলজুক সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এই মসজিদটি নব্য তুর্কি স্থাপত্যশৈলিতে নির্মিত। টার্কিশ রাজধানী আঙ্কারায় অবস্থিত বিশাল এই মসজিদটিতে একসাথে ৬০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে। ২০১৪ সালে সকলের জন্য উন্মুক্ত মসজিদটির প্রধান গম্বুজটি ৩৩ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট এবং ৬৬ মিটার উচ্চতার ৪ টি মিনার রয়েছে যা সেলজুক সাম্রাজ্যর নিদর্শন বহন করে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ ॥ খ্রিস্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জানুয়ারি	১৬ জুমা. উলা.	শুক্রবার	৫ : ২১	৬ : ৪০	১২ : ০২	৩ : ০৩	৫ : ২৪	৬ : ৪৩
০৫ ,,	২০ ,,	মঙ্গলবার	৫ : ২২	৬ : ৪১	১২ : ০৪	৩ : ০৫	৫ : ২৬	৬ : ৪৬
১০ ,,	২৫ ,,	রবিবার	৫ : ২৩	৬ : ৪২	১২ : ০৬	৩ : ০৯	৫ : ৩০	৬ : ৪৯
১৫ ,,	০১ জুমা. আখেরাহ	শুক্রবার	৫ : ২৪	৬ : ৪২	১২ : ০৮	৩ : ১২	৫ : ৩৩	৬ : ৫২
২০ ,,	০৬ ,,	বুধবার	৫ : ২৪	৬ : ৪২	১২ : ০৯	৩ : ১৫	৫ : ৩৭	৬ : ৫৫
২৫ ,,	১১ ,,	সোমবার	৫ : ২৩	৬ : ৪১	১২ : ১১	৩ : ১৮	৫ : ৪১	৬ : ৫৮

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+৩	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	+১	+১	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	০
রাজবাড়ী	+৫	+৫	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+২	+২	০
গোপালগঞ্জ	+৫	+৫	+১
মাদারীপুর	+৪	+৩	০
মানিকগঞ্জ	+৩	+৩	+২
শরিয়তপুর	+১	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+২
শেরপুর	-২	০	+৪
জামালপুর	০	+১	+৫
নেত্রকোনা	-৪	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৯
কক্সবাজার	+২	০	-১১
খাগড়াছড়ি	-৩	-৩	-৭
রাঙ্গামাটি	-২	-৩	-৯
বান্দরবন	-১	-৩	-১১
কুমিল্লা	-১	-১	-৫
নোয়াখালী	+২	০	-৪
লক্ষীপুর	+২	+১	-৩
চাঁদপুর	+১	+১	-৩
ফেনী	০	-১	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৩
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	+৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৩	+৪	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১১
নাটোর	+৫	+৫	+৭
পাবনা	+৮	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৮	+৩	+৯
জয়পুরহাট	+৭	+২	+১০

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৯
দিনাজপুর	+২	+৪	+১১
গাইবান্ধা	০	+২	+৭
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৭
লালমনিরহাট	-২	+১	+১০
নীলফামারী	০	+২	+১১
পঞ্চগড়	০	+৩	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+২	+৫	+১৩

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+১০	+৮	+২
বাগেরহাট	+৮	+৫	০
সাতক্ষীরা	+১১	+৯	+২
যশোর	+৭	+৮	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৮	+৮	+৬
ঝিনাইদহ	+৭	+৭	+৪
কুষ্টিয়া	+৭	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৮	+৭
মাগুরা	+৬	+৬	+৩
নড়াইল	+৭	+৬	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৬	+৩	-৩
পিরোজপুর	+৭	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৮	+৩	০
ভোলা	+৪	+৩	-৪
বরগুনা	+৮	+৪	-২

৫ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি - ২০২১
পৌষ-মাঘ ১৪২৭
জুমা. উলা-জুমা. ছানী
১৪৪২

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	১৮০/-	৩৬০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ

» হজ্জ ও উমরা (পর্ব-৬) ০৪
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা (পর্ব-১৮) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণ (পর্ব-৪) ১০
-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

» আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (পর্ব-৩) ১৩
মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
অনুবাদ : আখতারুজ্জান বিন মতিউর রহমান

» সালাফী জামাআত বনাম ভ্রান্ত দলসমূহ ১৫
-মাহবূবুর রহমান মাদানী

» 'মূর্তি বিড়ম্বনার ইসলামি আঙ্গিক' শীর্ষক প্রবন্ধের পর্যালোচনা ১৯
-আহমাদুল্লাহ

» পোশাক ও বর্তমান পরিস্থিতি : একটি পর্যালোচনা ২২
-সাজ্জাদ সালাদীন

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে

» পাপ ও তওবার মাঝে বান্দার অবস্থান কেমন হওয়া উচিত ২৪
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

◈ তরুণ প্রতিভা

» ওযূর গুরুত্ব ও ফযীলত ২৭
-মো. দেলোয়ার হোসেন

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ

» মূর্তি বনাম ভাস্কর্য ইস্যু : উত্তেজনা, বিতর্ক ও আন্দোলন ২৯
-জুয়েল রানা

◈ দিশারী

» ধূমপান কি হারাম? 36
-জাবির হোসেন

◈ জামি'আহ পাতা

» ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য ৩৯
-শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

» হিজাবের অসীলায় বাঁচল প্রাণ ৪১
-মুহাম্মদ সাজিদ করিম

◈ কবিতা ৪২

◈ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪৩

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভাস্কর্য স্থাপন বন্ধ করুন :

আমাদের সোনার বাংলায় বহু ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, নির্মাণাধীন রয়েছে এবং নির্মাণের ভবিষ্যত পরিকল্পনাও আছে। এদেশে এগুলো আগেও ছিল, এখনও আছে। তবে এখন বেশ জোরেসোরে এর আয়োজন চলছে। অনেকে আজ মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে আর নানা খোড়া যুক্তি ও অজুহাত খাড়া করে ভাস্কর্য স্থাপনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন। আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে ভাস্কর্য ও মূর্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভাস্কর্যের ইংরেজি sculpture (স্কাল্পচার) আর মূর্তির ইংরেজি statue (স্ট্যাচু)। অথচ Statue of Liberty সহ পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাস্কর্যগুলোকে Statue (মূর্তি) বলা হয়। এ স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বুঝা যায়, ভাস্কর্য ও মূর্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুঃখজনক হলো, দ্বীনের ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ নন, তারাই এ ব্যাপারে মুখ খুলছেন। এদিকে 'ভাস্কর্য, ম্যুরাল, প্রতিকৃতি, স্ট্যাচু ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় সে বিষয়ে সচেতনতা গড়তে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীবকে গণমাধ্যমে প্রচার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট' *(বাংলা ট্রিবিউন)*। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দুনিয়ালোভী একশ্রেণির দরবারী মুনশী। সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা বললে তার পরিণাম জাহান্নাম *(বুখারী, হা/১২৯১)*।

ইসলামে শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ *(বুখারী, হা/২৬৫৪)*, তওবা ছাড়া যা আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না *(আন-নিসা, ৪/৪৮ ও ১১৬)*। সেকারণে ইসলাম শিরক এবং শিরকের যাবতীয় মাধ্যমের মূলোৎপাটন করেছে। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু শিরক সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় বায়আতুর রিযওয়ানের গাছটি পর্যন্ত কেটে ফেলেছিলেন *(ফাতহুল বারী, ৭/৪৪৮)*। এরই ধারাবাহিকতায় ভাস্কর্য বা মূর্তি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এর ভূরি ভূরি দলীল মিলে। সৃষ্টি করা, আকৃতিদান করা আল্লাহর কাজ *(আলে ইমরান, ৩/৬)* আর মূর্তি-ভাস্কর্য বানানো মানে আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপচেষ্টা চালানো *(বুখারী, হা/৫৯৫৪)*। ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাতা ও প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারী সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব *(বুখারী, হা/৪২৭)*। ক্বিয়ামতের দিন প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারীদের কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে *(বুখারী, হা/৫৯৫০)*। ভাস্কর্য নির্মাতার উপর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন *(বুখারী, হা/৫৩৪৭)*। যেসব ঘর-বাড়িতে মূর্তি-ভাস্কর্য থাকে, সেখানে ফেরেশতা পর্যন্ত প্রবেশ করেন না *(বুখারী, হা/৩২২৫)*। সেকারণে ইসলাম ভাস্কর্য ও মূর্তি ভাঙতে বলেছে; গড়তে নয়। নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মূর্তি ভেঙেছেন *(আছ-ছফফাত, ৩৭/৯৩)*। আমাদের একমাত্র আদর্শ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে মূর্তি ভেঙেছেন *(বুখারী, হা/৪২৮৭)*, ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম, হা/৯৬৯)* এবং ভাঙতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন *(বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা, হা/১১৪৮৩)*।

এর বিপরীতে ভাস্কর্যপ্রেমীদেরকে কিছু দলীল পেশ করতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলো বিভ্রাট সৃষ্টি ও কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। যেমন- (১) সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর চাহিদা অনুযায়ী ভাস্কর্য নির্মাণের কথা কুরআনে এসেছে *(সাবা, ৩৪/১৩)*। **জবাব :** এ ভাস্কর্য আসলে কোনো প্রাণীর ছিল না, অথবা তা তাঁর শরীআতে অনুমোদিত থাকলেও আমাদের শরীআতে নিষিদ্ধ *(ফাতহুল বারী, ১০/৩৮২)*। তাছাড়া এর বিপরীতে কুরআনের বহু আয়াত আছে, যেখানে মূর্তি-ভাস্কর্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(দ্র. আল-হাজ্জ, ২২/৩০; নূহ, /২৩; আল-আম্বিয়া, ২১/৫২; আছ-ছফফাত, ৩৭/৯৫-৯৬; ঐ, ৩৭/৯১-৯৩)*। (২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘরে পুতুল ছিল। **জবাব :** এ পুতুল ছিল ছোট মেয়ের খেলার জন্য। তা তুলা/কাপড়ের তৈরি হওয়ায় পুরোপুরি মানুষের অবয়ব তাতে বিদ্যমান ছিল না। এগুলো সম্মানজনকভাবে স্থাপিত ছিল না। এর বিপরীতে মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে নিষেধের অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া এটাকে পুঁজি করে অন্য কোনো ছাহাবী ভাস্কর্য নির্মাণ করেননি। (৩) ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম মিশর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও মূর্তি ভাঙেননি। **জবাব :** মূর্তিগুলো এমন দূরবর্তী স্থানে ছিল, যেখানে ছাহাবায়ে কেরাম পৌঁছতে পারেননি। কারণ মিশর জয় মানে এই নয় যে, মিশরের সব জায়গায় যাওয়া। ঐসব মূর্তি-ভাস্কর্ক ফেরাঊনদের বাসা-বাড়িতে থাকায় ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম সেখানে প্রবেশ করেননি। কারণ রাসূল গযবের এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, হা/৩৩৮১)*। ঐসব ভাস্কর্যের অনেকগুলোই মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল, যা পরবর্তীতে

উদ্ঘাটিত হয়। বিশালাকৃতির শক্ত মূর্তিগুলো ভাঙার সাধ্য তাদের ছিল না। কারণ বর্তমান যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও এগুলো ভাঙতে কাঠখড়ি পোড়াতে হয়। (৪) এসব ভাস্কর্য হচ্ছে শিল্প ও সৌন্দর্য। **জবাব :** সব শিল্প আমাদেরকে ধরতে হবে এমনটা নয়। বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী শিল্প হলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ফলে আপনি ইসলাম অনুমোদিত শিল্প চর্চা করুন এবং তা দিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করুন। (৫) এসব ভাস্কর্য স্মৃতি হয়ে থাকে এবং চেতনা সৃষ্টি করে। **জবাব :** মানুষ সারা জীবন বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে; ভাস্কর্য লাগে না। ইসলামের বিখ্যাত সব ব্যক্তি, যাদের কোথাও কোনো ভাস্কর্য নেই, অথচ তারা বেঁচে আছেন প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে। তাদের আদর্শ লালন করছেন লক্ষ-কোটি মুসলিম নর-নারী। এর বিপরীতে অনেকের ভাস্কর্য আছে, কিন্তু মানুষ তাদেরকে চিনে না। অনেককে চিনলেও ঘৃণার সাথে চিনে। নূহ আলাইহিস সালাম-এর ক্বওম এই চেতনা সৃষ্টি করতে গিয়েই শিরকে জড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এসব ভাস্কর্যকে ঘিরে শিরকের আড্ডা বসবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?! (৬) বিভিন্ন মুসলিম দেশে ভাস্কর্য আছে। তাহলে আমাদের থাকলে দোষ কী? **জবাব :** কোনো দেশ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ইসলামের দলীল নয়। দলীল হচ্ছে, কুরআন ও হাদীছ এবং তা হতে হবে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। তাছাড়া যেসব দেশের কথা বলা হচ্ছে, সেসব অনেক দেশে তো শারঈ বিধান চালু আছে। তাহলে আপনি সেটা আমদানি করছেন না কেন?

ভাস্কর্যের মাধ্যমে অঢেল অর্থের অপচয় হয়। বিনিময়ে ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করা হয়। কারণ বছরের হাতে গোনা কয়েকদিন তা ধুয়েমুছে সাফ করে তাতে ফুল দিলে যদি তার সম্মান-শ্রদ্ধা বাড়ে, তাহলে সারা বছর রোদ-ধুলা-ময়লায় পড়ে থাকলে, পাখপাখালি মাথায়, চোখ-মুখে পায়খানা করলে তাতে লাঞ্ছিত হবে না কেন?! ভাস্কর্যের ঘাড়ে-মাথায় ছেলেমেয়েরা চড়লে, বেদিতে কুকুর-শৃগাল পায়খানা করে দিলে ব্যক্তির অসম্মান হবে না কেন?! বিষয়গুলো আবেগ দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে ভাবার অনুরোধ রইল। আল্লাহর কসম! আমাদের অবস্থান স্রেফ ভাস্কর্য ও মূর্তির বিরুদ্ধে; কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়। ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, তা আমাদের কাছে কোনো বিষয়ই নয়। বরং মনুষ্যজাতির বাইরে অন্য জীব-জানোয়ারের ভাস্কর্য হলেও ইসলামে তা নিষিদ্ধ এবং আমরা তার বিরুদ্ধে। আরেকটি ব্যাপার হলো, ভাস্কর্যকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ বলে দাবি করা হচ্ছে এবং এর বিপক্ষে অবস্থানকারীদের স্বাধীনতাবিরোধী ট্যাগ দেওয়া হচ্ছে! ভুলে গেলে চলবে না, এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে প্রথম ভাস্কর্য নির্মিত হয় ১৯৭৩ সালে। তাহলে যে ভাস্কর্য নির্মিত হলো মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার ২ বছর পরে, তা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ হয়?! অতএব, স্বচ্ছ পানি যেন ঘোলা করা না হয়।

আসলেই যদি কোনো মৃত ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করা হয়, তাহলে তার জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে। অযথা ভাস্কর্য নির্মাণের পেছনে অর্থ নষ্ট না করে একাজগুলো করুন- (ক) এমন সব জনকল্যাণমূলক কাজ করুন, যার কারণে মানুষ এমনিতেই মন থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে। আর তিনি এর দ্বারা উপকৃত হবেন *(মুসলিম, হা/১৬৩১, ২৭৩৩)*। (খ) মৃত ব্যক্তির নামে দান-ছাদাক্বা করুন। তিনি এর নেকী পাবেন *(বুখারী, হা/১৩৮৮)*। (গ) মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ-উমরা করিয়ে নিন। তিনি এর নেকী পেয়ে যাবেন *(আবু দাঊদ, হা/১৮১১)*। (ঘ) মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করুন। (ঙ) গরীব, মিসকীন, অসহায়, দুস্থদের সেবায় এগিয়ে আসুন।

পরিশেষে নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, 'হে আমার রব! তুমি এ নগরীকে নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে প্রতিমাপূজা থেকে রক্ষা করো' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৫)*।

www.al-itisam.com

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*

(পর্ব-৬)

হজ্জ ও উমরা পালনকারী ভাই-বোনদের জন্য জরুরী কথা :

সম্মানিত হজ্জ ও উমরা পালনকারী ভাই-বোন! বর্তমান ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাজারে বহু ধরনের দলীল-প্রমাণহীন হজ্জ ও উমরার বই হতে সাবধান থাকুন। কারণ এসব বই পড়ে হজ্জ উমরা করলে তা কবুল হবে বলে আশা করা যায় না। তাই শুধু কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বই-পুস্তক পড়েই হজ্জ-উমরা পালন করার চেষ্টা করতে হবে। মনগড়া বানাওয়াট দু'আ এবং বিদআতী নিয়্যতে পূর্ণ বই পড়া হতে সাবধান থাকতে হবে। হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং এতে লম্বা সফর থাকার কারণে মানুষ সঠিকভাবে ইবাদত করার পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারে না। তাই সহজেই শিরক-বিদআতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। যার কারণে প্রথমেই এ সতর্কবাণী।

বাড়ি হতে বের হওয়ার দু'আ :

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ি হতে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

'আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আমার কোনো উপায় এবং ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত' তখন তাকে বলা হয়, আপনাকে বাঁচিয়ে নেওয়ার জন্য এটা আপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়েছে। এরপর শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।[১] উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার ঘর থেকে বের হলেই আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া ও বিপথগামী করা হতে এবং যুলুম করা ও মাযলূম হওয়া হতে। আমি আরও আশ্রয় চাই কারও সাথে জাহেলী আচরণ করা বা আমার উপরে জাহেলী আচরণ করা হবে এমন হতে'।[২]

স্থলপথে অথবা আকাশপথে সফরের দু'আ :

ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফরের উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনি তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে এই দু'আ পড়তেন,

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهُ اَللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ اَللّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ

'ঐ সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি এটিকে (বাহন) আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা তাকে অনুগত করতে সক্ষম নই এবং অবশ্যই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার নিকট নেকী ও তাক্বওয়া চাই আর তোমার পছন্দনীয় আমল চাই। হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের উপর সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের এই সফরের সাথী আর পরিবারের রক্ষক। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট, ভীতিকর দৃশ্য এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি হতে'।[৩] আর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন। তবে এই শব্দগুলো বেশি বলতেন,

أَيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

'আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে, ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের রবের প্রশংসা করতে করতে'।[৪] হজ্জ এর আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা পোষণ করা। শরীআতের পরিভাষায় হজ্জ হচ্ছে, নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত নিয়মে কা'বা ঘর যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করার নাম হজ্জ।

হজ্জ-এর প্রকারভেদ :

হজ্জ পালন পদ্ধতি হিসেবে হজ্জ তিন প্রকার: (১) তামাত্তু (২) কিরান (৩) ইফরাদ।

১. তিরমিযী, হা/৩৪২৬, হাদীছ ছহীহ।
২. আবূ দাঊদ, হা/৫০৯৬; মিশকাত, হা/২৪৪২।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪২৫; ইবনু খুযায়মা, হা/২৫৪২।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪২; মিশকাত, হা/২৪২০, পৃ. ২১৩।

(১) তামাত্তু হজ্জ : হজ্জের মাস শাওয়াল, যুলক্বা'দা এবং যুলহিজ্জার প্রথম ১০ দিনে শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে উমরার কাজ সম্পূর্ণ করে হালাল হয়ে পুনরায় যুলহিজ্জা মাসের ৮ তারিখে মক্কা হতে ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ সম্পূর্ণ করাকে তামাত্তু হজ্জ বলে।

(২) ক্বিরান হজ্জ : এটার পদ্ধতি দুই ধরনের হতে পারে। (ক) এক সাথে উমরা এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং উমরার কাজ শেষ করে হজ্জের কাজ শুরু করে যুলহিজ্জার ১০ তারিখে ইহরাম হতে হালাল হওয়া। এ সময় কুরবানীর পশু সাথে থাকতে হবে। (খ) প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর উমরার ত্বাওয়াফ শুরু করার সময় উমরার ইহরামের সাথে হজ্জকে শামিল করে নিবে। ক্বিরান হজ্জ পালনকারীকে কুরবানীর পূর্ণ প্রস্তুতি সাথে রাখতে হবে।

(৩) ইফরাদ হজ্জ : শুধু হজ্জ এর ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ সম্পাদন করে ১০ তারিখে হালাল হওয়াকে ইফরাদ বলা হয়।

হজ্জের উত্তম নিয়ম : উক্ত তিন প্রকারের যে কোনো নিয়মে হজ্জ পালন করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো তামাত্তু হজ্জ। কারণ নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে তামাত্তু হজ্জ করার জন্য আদেশ করেছেন।[৫] হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, 'হে মুহাম্মাদের পরিবার বা অনুসারীরা! তোমাদের মধ্যে কেউ হজ্জ করার ইচ্ছা করলে সে যেন হজ্জের প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধে'।[৬] এই হাদীছে রাসূল ﷺ উমরাকে হজ্জের সাথে মিলানোর আদেশ করেছেন। অতএব সকল মানুষের তামাত্তু হজ্জ করা উচিত। তামাত্তু হজ্জে আরও একটি সুবিধা এই যে, উমরা হতে হালাল হয়ে ৮ তারিখের পূর্বপর্যন্ত ইহরামমুক্ত জীবনযাপন করা যায়। এটা হাজীদের জন্য অনেক সহজ ও সুবিধাজনক।

উমরা এর শাব্দিক অর্থ- পরিদর্শন করা অর্থাৎ ইবাদত করার আশায় কা'বা ঘর পরিদর্শন করা। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ, ছাফা-মারওয়া সাঈ ও মাথা ন্যাড়া বা চুল ছোট করার মাধ্যমে বিশেষ ইবাদত করাকে উমরা বলা হয়।

হজ্জ-উমরা সম্পর্কে আল্লাহর জরুরী বিধান :

যারা সামর্থ্য রাখে, তাদের জন্য হজ্জ-উমরা জীবনে একবার পালন করা অপরিহার্য। একবারের অধিক হলে তা নফল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ 'তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ-উমরা পালন করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৬)*। হজ্জ-উমরার মানত করলে তা পালন করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'যারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যে দিন মানুষের অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়বে' *(আদ-দাহর, ৭৬/৮)*। হজ্জ একটি ফরয বিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 'আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের পালনীয় কর্তব্য হলো, যার কা'বা ঘর পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য আছে, সে যেন বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করে। আর যে ব্যক্তি এ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে তার মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন' *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইবনে ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: ১. এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল ২. ছালাত প্রতিষ্ঠা করা ৩. যাকাত প্রদান করা ৪. হজ্জ আদায় করা এবং ৫. রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা'।[৭] উমরা হজ্জের ন্যায় জরুরী ইবাদত'।[৮]

হজ্জ ও উমরার মাঝে পার্থক্য :

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি। উমরা কোনো রুকন নয়। বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হজ্জ একটি নির্ধারিত সময়ে পালন করতে হয়। কিন্তু উমরা যে কোনো সময় পালন করা যায়। তামাত্তু ও ক্বিরান হজ্জ পালন করলে একটি উমরা আদায় হয়ে যায়, কিন্তু উমরা করলে হজ্জ পালন হয় না। উমরার চেয়ে হজ্জের গুরুত্ব অনেক বেশি। এজন্য সামর্থ্য থাকার পরও হজ্জ না করলে ঈমান নিয়ে টিকে থাকা কঠিন।

(চলবে)

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮, ৭২২৯, ৭২৩০; মিশকাত, হা/২৫৫৮।
৬. ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩৯২২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৫৯০।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৩২৫৭; ইবনে মাজাহ, হা/২৯০১।
৮. ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/৩০৬৫।

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(নভেম্বর'২০ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-১৮)

ঈমান :

সম্মানিত পাঠক! চলুন বরাবরের মতো প্রথমে দেখে আসি, ঈমানের সঠিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা কী? পরবর্তী আলোচনা সহজে বুঝার জন্য আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়টি দেখব। কারণ এর আগে আমরা এ ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত জেনে এসেছি।

'আল-ঈমান' (اَلْإِيْمَانُ) শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ-এর মাছদার। অভিধানিক অর্থ- اَلتَّصْدِيْقُ 'আন্তরিক বিশ্বাস', اَلْإِقْرَارُ وَالطَّمَأْنِيْنَةُ 'স্বীকৃতি ও প্রশান্তি'। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ শেষোক্ত অর্থটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা হৃদয়ে যখন আন্তরিক বিশ্বাস ও বশ্যতা স্থান পায়, তখনই কেবল স্বীকৃতি ও প্রশান্তি অর্জিত হয়।[১] শরীআতের পরিভাষায়,

تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ.

'অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি, আমলে বাস্তবায়নের নাম ঈমান, যা পুণ্য দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং পাপ দ্বারা হ্রাস পায়'।[২]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট, কথা ও কাজের নাম ঈমান। এর ভূরি ভূরি দলীল মিলে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

'ঈমানের ৭০ বা ৬০টিরও উপরে শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তম হলো, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা'।[৩] হাদীছটিতে 'রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা'-কে ঈমানের একটি শাখা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা' কাজ নয় কি? ইবনু আবিল ইয আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَإِذَا كَانَ الْإِيْمَانُ أَصْلًا لَهُ شُعَبٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَكُلُّ شُعْبَة مِنْهَا تُسَمَّى إِيمَانًا فَالصَّلَاة مِنَ الْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالْأَعْمَالُ الْبَاطِنَة، كَالْحَيَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْخَشْيَة مِنَ اللهِ وَالْإِنَابَة إِلَيْهِ، حَتَّى تَنْتَهِي هَذِهِ الشُّعَبُ إِلَى إِمَاطَة الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ.

'ঈমান হচ্ছে মূল, যার বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর প্রত্যেকটি শাখাকে 'ঈমান' বলা হয়। ফলে ছালাত, যাকাত, ছওম ও হজ্জ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে গোপন আমলও। যেমন লজ্জা, ভরসা, আল্লাহর ভয় ও তাঁর নিকট তওবা। এভাবে 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা' পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে এসব শাখা-প্রশাখা। কেননা সেটাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত'।[৪] **সেজন্য, ঈমানের পারিভাষিক অর্থে মৌলিকভাবে পাঁচটি বিষয় থাকা জরুরী। যথা- ১. অন্তরের কথা, ২. মুখের স্বীকৃতি, ৩. অন্তরের আমল, ৪. মুখের আমল ও ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল।**[৫] ইমাম আজুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

بَابُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِيْمَانَ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُوْنُ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ تَجْتَمِعَ فِيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ.

'অনুচ্ছেদ : ঈমান অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজের নাম। কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না,

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. দ্রষ্টব্য : আছ-ছরেমুল মাসলূল, প্রকাশক : সঊদী বোর্ডার গার্ড, তা. বি.), পৃ. ৫১৯।

২. ইবনু তায়মিয়্যা, আল-আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বিইয়াহ, তাহক্বীক্ব : আশরাফ ইবনে আব্দুল মাক্বছূদ (রিয়ায : আযওয়াউস সালাফ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১১৩; আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হামীদ আল-আছারী, (আল-ওয়াজীয ফী আক্বীদাতিস সালাফিছ ছলেহ, প্রকাশক : সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাশ : ১৪২২ হি.), পৃ. ১০৩।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮।

৪. ইবনু আবিল ইয, শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবিইয়াহ, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকের, (সঊদী আরব : ধর্ম, ওয়াকফ, দাওয়াত ও দিক-নির্দেশনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ : ১৪১৮ হি.), পৃ. ৩২৩।

৫. ইবনু তায়মিয়্যা, আল-আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বিইয়াহ, পৃ. ১১৩।

যতক্ষণ না তার মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটবে'।[৬] এরপর তিনি বলেন,

ثُمَّ اعْلَمُوْا أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيْق إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُ الْإِيْمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقًا وَلَا تُجْزِيءُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، حَتَّى يَكُوْنَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، فَإِذَا كَمُلَتْ فِيْهِ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْخِصَالِ كَانَ مُؤْمِنًا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ، وَقَوْلُ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ.

'অতঃপর জেনে রাখুন, শুধু অন্তরের বিশ্বাস যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না এর সাথে মৌখিক স্বীকৃতি থাকবে। অনুরূপভাবে অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না এর সাথে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল থাকবে। অতএব কোনো ব্যক্তির মাঝে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে সে-ই 'মুমিন' হিসাবে গণ্য হবে। কুরআন, হাদীছ এবং ওলামায়ে মুসলিমীনের বক্তব্য এ কথারই প্রমাণ বহন করে'।[৭]/[৮]

অনুরূপভাবে ঈমান বাড়ে ও কমে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'মুমিন তো কেবল তারাই, যাদের সামনে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে' *(আল-আনফাল, ৮/২)*। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

'ঈমানের ৭০ বা ৬০টিরও উপরে শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তম হলো, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা' এবং সর্বনিম্নটি হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা'।[৯] হাদীছটি ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির উৎকৃষ্ট দলীল। নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি উল্লেখপূর্বক বলেন,

وَفِيْ هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيْمَانَ فِيْهِ أَعْلَى وَأَدْنَى وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ قَابِلاً لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ.

'ঈমানের যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তর রয়েছে, তার দলীল এই হাদীছে মিলে। ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে বুঝতে হবে- ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে'।[১০]

আমরা আগে দেখে এসেছি যে, ঈমানের মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর দুটো ভুল হয়ে গেছে। শুধু হৃদয়ের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতিকে তিনি ঈমান হিসাবে আখ্যায়িত করতেন; আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতেন না। তিনি বলেন, اَلْإِيْمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَتَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ 'মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস হচ্ছে ঈমান'।[১১] এটা তার প্রথম ভুল। তার আরেকটি ভুল হচ্ছে, 'ঈমান বাড়েও না, কমেও না'।[১২] তিনি বলেন, وَالْإِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ 'আর ঈমান বাড়েও না, কমেও না'।[১৩]

এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে আমরা প্রমাণ পেয়েছিলাম যে, কারও কারও মতে, ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) তার এই মত থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাছাড়া এই ভুল প্রমাণিত হলেও তিনি এর জন্য গোনাহগার হবেন না; বরং ইজতেহাদের জন্য একটি নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সেকারণে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর ঈমান সম্পর্কিত আক্বীদার সাথে মাতুরীদীদের আক্বীদার কিছু মিল ও অমিল পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

মিল :

১. আমলকে ঈমান থেকে বের করে দেওয়া। শুধু সত্যায়নই ঈমান।

২. ঈমান বাড়েও না, কমেও না।

৩. ঈমানে 'ইস্তিছনা' হারাম।[১৪]

---

৬. আবুবকর আল-আজুরী, আশ-শারীআহ, (রিয়ায : দারুল ওয়াত্বান, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ২/৬১১।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. ঈমানের পরিচয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, ঈমানের মূলনীতি, পৃ. ৯-১৬।

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮।

১০. ছিদ্দীক্ব হাসান খান (মৃ. ১৩০৭ হি.), ফাতহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআন, (ছয়দা, বৈরূত : আল-মাকতাবাহ আল-আছরিইয়াহ, ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খ্রি.), ৫/১৩১।

১১. ইমাম আবু হানীফা, কিতাবুল ওয়াছিয়্যাহ, (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১ম প্রকাশ : ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৭-২৮।

১২. দ্রষ্টব্য : আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব ওয়া বায়ানুল ফিরক্বাতিন নাজিয়াহ, পৃ. ১৯১; আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১/১৪১।

১৩. আবু হানীফা, কিতাবুল ওয়াছিয়্যাহ, তাহক্বীক্ব : আবু মুআয মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল হাই উওয়াইনা, (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১ম প্রকাশ : ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৯।

১৪. সহজ ভাষায় 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ'- এমন কথা বলাকে 'আল-ইস্তিছনা ফিল ঈমান' বা ঈমানে ইস্তিছনা বলা হয়। এটি পরবর্তীতে সৃষ্ট একটি মাসআলা। সালাফে ছালেহীনের প্রথম যুগের মানুষদের কাছে এটি পরিচিত ছিল না। যাহোক, মাসআলাটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। (ক) কুল্লাবিয়্যাদের নিকট, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ' এভাবে বলা ওয়াজিব। (খ) মুরজিআ ও

৪. কাবীরা গোনাহগারকে কাফের বলা যাবে না। উল্লেখ্য, কাবীরা গোনাহগারের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতও এ আক্বীদাই পোষণ করে।

অমিল :

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট 'অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি'র নাম ঈমান। অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ও অংশ। কিন্তু আবু মানছূর মাতুরীদী ও তার অধিকাংশ অনুসারী মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমানের স্বরূপের বাইরে গণ্য করে থাকেন। তারা মনে করেন, শুধু অন্তরের বিশ্বাসই ঈমান। তবে, তারা মৌখিক স্বীকৃতিকে দুনিয়াবী হুকুমের শর্ত হিসাবে গণ্য করেন।[১৫]

প্রিয় পাঠক! ঈমানের সংজ্ঞা, হ্রাস-বৃদ্ধি ও ইস্তিছনার ব্যাপারে মাতুরীদীদের এই আক্বীদা প্রমাণে তারা কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের নিরিখে ও সালাফে ছালেহীনের মূলনীতির আলোকে সেগুলো মোটেও টিকে না। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলো এখানে বিশ্লেষণ করা হলো না।

যাহোক, ঈমানের যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আমরা ইতোপূর্বে দেখে এসেছি, সেটাই কুরআন-হাদীছে বর্ণিত এবং সালাফে ছালেহীনের গৃহীত ও অনুসৃত ঈমান। ফলে সেই ঈমানই আমাদেরকে ধারণ করতে হবে।

তাক্বদীর : তাক্বদীর ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। প্রকৃত মুমিন হতে হলে অবশ্যই তাক্বদীরে বিশ্বাস করতে হবে, তাক্বদীরে বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাক্বদীর সম্পর্কিত অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। সেজন্য ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য যারপর নেই বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ আল্লাহর কতিপয় নাম ও ছিফাতের (গুণ) সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক।[১৬]

আল-হামদুলিল্লাহ তাক্বদীরের ক্ষেত্রে মাতুরীদীরা সালাফে ছালেহীনের নীতি থেকে সরে যাননি। বরং ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) সহ অন্যান্য সালাফে ছালেহীন তাক্বদীরের ব্যাপারে যে আক্বীদা পোষণ করতেন, মাতুরীদীরাও সেই আক্বীদাই পোষণ করেন। তারা মনে করেন, তাক্বদীরের ৪টি স্তর রয়েছে। কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই তার বিনা ইচ্ছায় হয় না। বান্দার ভালো-মন্দ কর্মও মূলত আল্লাহরই সৃষ্টি। বান্দা তার কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন ও তার শক্তি রয়েছে। সে কোনো কিছু করতে বাধ্য নয়। সে তার ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োগ করেই কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুই করে থাকে, যে ইচ্ছা ও শক্তি মহান আল্লাহই তাকে দান করেছেন।[১৭]

নবুঅত : নবুঅত নিয়ে ইমাম আবু হানীফা ও হানাফীদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গেলে আসলে দুটি বিষয় উঠে আসে। **(ক) নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর নবুঅত ও রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে কীভাবে? (খ) নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর কর্তৃক ভুল-ত্রুটি হতে পারে কিনা?**

প্রথম বিষয়টির ব্যাপারে আবু মানছূর মাতুরীদী মনে করেন, নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) নবুঅত ও রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্তির আগে এবং পরে তাদের নবী বা রাসূল হওয়ার সত্যতা তাদের সৃষ্টিগত ও আদর্শগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়। অনুরূপভাবে মু'জিযা দ্বারাও সাব্যস্ত হয়।[১৮] কিন্তু অধিকাংশ মাতুরীদী মনে করেন, নবুঅত ও রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্তির সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য মু'জিযা ছাড়া অন্য কোনো দলীল নেই। কারণ তাদের মতে, নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম)-এর নবুঅত ও রিসালাতের দায়িত্ব প্রাপ্তির ব্যাপারটা প্রমাণের জন্য কেবলমাত্র মু'জিযা নিশ্চিত জ্ঞানের (اَلْعِلْمُ الْيَقِيْنِيُّ) ফায়েদা দেয়।[১৯] বাযদাবী বলেন, وَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوْتُ الرِّسَالَةِ بِلَا دَلِيْلٍ؛ فَيَكُوْنُ الثُّبُوْتُ بِالدَّلَائِلِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الدَّلَائِلُ إِلَّا الْمُعْجِزَاتِ 'দলীল ছাড়া রিসালাত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটা ভাবাও যায় না। সুতরাং দলীল দ্বারাই তা সাব্যস্ত হতে হবে। আর সেই দলীল মু'জিযা ছাড়া আর কিছুই নয়'।[২০]

কোনো সন্দেহ নেই যে, নবুঅত ও রিসালাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মু'জিযা বিশুদ্ধ দলীল। কিন্তু মু'জিযা ছাড়া নবুঅত ও রিসালাত সাব্যস্ত হয় না- একথা মোটেও ঠিক নয়। বরং আরও বিভিন্নভাবেও

জাহমিয়্যাদের নিকট, এভাবে বলা হারাম। (গ) কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট, দুটি দিক বিবেচনায় এটি কখনো হারাম আবার কখনো ওয়াজিব (দ্রষ্টব্য : আল-মাতুরীদিয়্যাহ : দিরাসাতান ওয়া তাক্বীমান, পৃ. ৪৬৮-৪৭১)।

১৫. উছূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ৬০৩-৬০৫।

১৬. তাক্বদীরের ব্যাপারে বিস্তারিত ও স্বচ্ছ ধারণা পেতে পড়ুন: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, 'তাক্বদীর : আল্লাহর এক গোপন রহস্য'।

১৭. দ্রষ্টব্য : মানহাজুল মাতুরীদিয়্যাহ ফিল আক্বীদাহ, পৃ. ৫৩-৫৪; তাক্বদীরের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পড়ুন : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, 'তাক্বদীর : আল্লাহর এক গোপন রহস্য'।

১৮. দ্রষ্টব্য: মাতুরীদী, আত-তাওহীদ, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

১৯. আল-মাতুরীদিয়্যাহ : দিরাসাতান ও তাক্বীমান, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।

২০. বাযদাবী, উছূলুদ্দীন, পৃ. ১০১-১০২।

নবুঅত ও রিসালাত সাব্যস্ত হয়। সত্য বলতে মাতুরীদীরা এ ব্যাপারে মু'তাযিলীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।[২১]

উল্লেখ্য, নবুঅত সাব্যস্ত হওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে তেমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না।[২২]

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বিষয়টিতে; **নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর কর্তৃক ভুল-ত্রুটি হতে পারে কিনা?** গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত হয়েছেন যে, নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম অহি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে মা'ছূম। এক্ষেত্রে তারা ভুলেও যান না, উদাসীনও হন না। আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ এমন ঘোষণাই দিয়েছেন। অন্যান্য নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম-এর বেলায়ও ব্যাপারটা সেরকমই। মহান আল্লাহ বলেন, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى 'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, যার ফলে তুমি ভুলে যাবে না' *(আল-আ'লা, ৮৭/৬)*। অহি পৌঁছানোর বাইরে অন্য ব্যাপারগুলোতে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য হলো, নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম ও মানুষ। ফলে সমস্ত মানুষের যা হতে পারে, তাদেরও তাই হতে পারে। তবে মহান আল্লাহ তাদেরকে কাবীরা গোনাহ থেকে রক্ষা করেছেন এবং রক্ষা করেছেন এমন ছাগীরা গোনাহ থেকে, যা হীন প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ তাদের মর্যাদার সাথে এমন ছাগীরা গোনাহ যায় না। তবে যেসব ছাগীরা গোনাহ ব্যক্তির হীনতা প্রমাণ করে না, সেগুলো নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম কর্তৃক ঘটা সম্ভব বলে সালাফে ছালেহীন মনে করেন। অবশ্য মহান আল্লাহ তাদেরকে সেই ছাগীরা গোনাহর উপর রেখে দেন না; বরং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অহি নাযিল করে তাদের সংশোধন করে দেন। নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর এজাতীয় কিছু ঘটনার কথা মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন, যার কারণে তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনাও করেছেন এবং সংশোধনও করে দিয়েছেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনা, যিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হেদায়াতপ্রাপ্তির জন্য এসেছিলেন; কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতাদের দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থাকায় তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। পরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভর্ৎসনা করে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন- عَبَسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى - أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى - أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى - وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى - وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى - وَهُوَ يَخْشَى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى 'সে মুখ ভার করল এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলো। কারণ তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি আসল। (হে নবী!) তুমি কি জানো, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে লাগত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ। সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার উপর কোনো দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে লোক তোমার কাছে ছুটে আসল আর সে ভয়ও করে, তুমি তার প্রতি অমনোযোগী হলে' *(আবাসা, ৮০/১-১০)*। এরকম আরও উদাহরণ আছে।

উল্লেখ্য, এই ভুল তাদের অনুসরণের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। বরং তাদের অনুসরণ অপরিহার্য। মহান আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 'ওরা হলো তারা, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছিলেন। ফলে তুমি তাদের পথ অনুসরণ করো' *(আল-আনআম, ৬/৯০)*। কারণ সেই ভুল আল্লাহ সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

যদি বলা হয়, তাদের সামান্য ভুল হতে পারে, কিন্তু কেন? এর পেছনে কী-বা হিকমাহ ও প্রজ্ঞা রয়েছে? জবাব হচ্ছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত করেছেন। কারণ আল্লাহ তাওবার মতো একটি প্রিয় ইবাদত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতে চাননি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি প্রতিদিন ৭০ বারের বেশি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ও তওবা করি'।[২৩]

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও স্বীকার করেছেন যে, নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর ভুল-ত্রুটি হতে পারে। তিনি বলেন, اَلْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطَايَا 'প্রত্যেক নবীই আলাইহিমুস সালাম ছাগীরা গোনাহ, কাবীরা গোনাহ, কুফর ও নিকৃষ্ট কাজকর্ম থেকে মুক্ত। তবে তাদের পক্ষ থেকে ভুলত্রুটি হতে পারে'।[২৪]

কিন্তু আবু মানছূর মাতুরীদী স্পষ্ট বলেছেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ভুলত্রুটির কথা জানা যায় না।[২৫] আর এই বিশ্বাস থেকেই মাতুরীদীরা কুরআন ও হাদীছের যেসব জায়গায় নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর ভুল-ত্রুটি প্রমাণিত, সেগুলো 'খবরে ওয়াহেদ' হলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। আর 'মুতাওয়াতির' হলে স্পষ্ট অপব্যাখ্যা করেছে।[২৬] আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা বিশুদ্ধ বিষয়গুলো বুঝার ও আমলে নেয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

(চলবে)

---

২১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আল-মাতুরীদিয়্যাহ : দিরাসাতান ও তাক্বীমান, পৃ. ৩৮১-৩৮৭।

২২. দ্রষ্টব্য : উছূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ৫৭৮।

২৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৭।

২৪. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃ. ৩৭।

২৫. আবু মানছূর মাতুরীদী, আত-তাওহীদ, পৃ. ২০২।

২৬. উছূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ৫৭৯।

ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণ

-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*

(পর্ব-৪)

শরীআত নির্দেশিত বৈধ অসীলা : ইসলামী শরীআতে তিন ধরনের অসীলা বৈধ, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো,

(ক) কৃত সৎ আমলকে অসীলা করে প্রার্থনা করা : কোনো ব্যক্তির বিপদে-আপদে বা জরুরী প্রয়োজেনে নিজের কৃত সৎ আমলকে অসীলা করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা বৈধ *(আল-মায়েদা, ৫/৩৫)*। এ মর্মে হাদীছ এসেছে, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘একদা তিন ব্যক্তি পথ চলছিল, এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পড়ল এবং একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিল। তৎক্ষণাৎ পর্বত হতে একখানা প্রকাণ্ড পাথর এসে গুহার মুখে পতিত হওয়ায় গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল, انْظُرُوْا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوْهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَادْعُوْا اللهَ بِهَا তোমরা নিজেদের এমন কোনো নেক কাজকে স্মরণ করো, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সেই কাজটিকে অসীলা করে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করো। আশা করা যায়, এর অসীলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দিবেন।

অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং আমার ছোট ছোট কয়টি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ-দুম্বা চরাতাম। আর যখন সন্ধ্যায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম, তখন তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে পান করানোর আগেই প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণভূমি আমাকে দূরে নিয়ে গেল। ফলে ঘরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম; কিন্তু আমি প্রতিদিনের মতো আজও দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে আসলাম এবং পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো সমীচীন মনে করলাম না। আর তাদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোও কল্যাণকর মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলো (ক্ষুধার তাড়নায়) আমার পায়ের কাছে কাঁদছিল। ভোর পর্যন্ত আমার ও তাদের অবস্থা এভাবে বিদ্যমান ছিল। (অবশেষে ঘুম হতে জাগার পর তাদেরকেই আগে দুধপান করালাম)। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এই কাজটি আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে এর অসীলায় আমাদের জন্য এতটুকু পথ করে দাও, যেন আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটিকে এই পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয়জন বলল, আমার এক চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি অত্যধিক ভালোবাসতাম, যতটা পুরুষেরা মহিলাদেরকে ভালোবাসতে পারে। আমি তাকে উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। সে তা অস্বীকার করল, যে পর্যন্ত না আমি তাকে ১০০ দীনার প্রদান করি। অতঃপর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে ১০০ দীনার সংগ্রহ করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর যখন আমি তার দুই পায়ের মধ্যখানে বসলাম, সে বলল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا ‘হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, মোহর খুলে দিয়ো না (অর্থাৎ আমার কুমারিত্ব নষ্ট করো না)’। তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো, এই কাজ আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য তার অসীলায় পথ প্রশস্ত করে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য পাথরটি আরও কিছু সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক ‘ফারক’ (টুকরী) পরিমাণ চাউলের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। যখন সে কাজ সম্পাদন করল, তখন বলল, আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তার পাওনা তাকে পেশ করলাম। সে অবহেলা করে তা ফেলে চলে গেল, অবশেষে আমি তাকে চাষাবাদে লাগালাম এবং পরিশেষে তা দ্বারা (বর্ধিত করতে করতে) অনেকগুলো গরু ও রাখাল যোগাড় করলাম। এরপর একদা সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, আমার উপর অবিচার করো না। আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো এবং তার রাখালগুলো নিয়ে যাও। (এইগুলো সমুদয় তোমারই)। সে বলল, আল্লাহ পাককে ভয় করো, আমার সাথে উপহাস করো না।

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। ঐ গরুগুলো রাখালসহ নিয়ে যাও। অতঃপর সে ঐগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এই কাজটি আমি তোমার ভয় ও সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলাম, তবে তার অসীলায় পাথরের অবশিষ্টাংশ খুলে দাও। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাথরখানি সরিয়ে অবশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত করে দিলেন'।[১]

(খ) আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের অসীলায় দু'আ করা : আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা দু'আ করা বৈধ। বরং তাঁর নামে দু'আ করাই উচিত। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। অতএব তোমরা সেগুলো দ্বারা তাঁকে ডাকো' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৮০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা স্মরণ করবে সে জান্নাতে যাবে'।[২]

বুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনলেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنِّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি এক, অনন্য ও অমুখাপেক্ষী যিনি কাউকে জন্ম দেননি আর তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং যাঁর কোনো সমকক্ষ নেই'। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সে আল্লাহকে তাঁর ইসমে আযম তথা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামের মাধ্যমে ডাকল, যা দ্বারা যখন কেউ তাঁর নিকট কিছু চায়, তিনি তাকে তা দান করেন। আর যা দ্বারা যখন কেউ তাঁকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।[৩]

(গ) জীবিত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির মাধ্যমে দু'আ চাওয়া : কোনো জীবিত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়া বা দু'আ-প্রার্থনা করা বৈধ। এ বিষয়ে হাদীছে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন-

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের মাঝে পড়ত, তখন উমার ﷺ আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ-এর মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে পানি প্রার্থনা করতাম আপনার নবী ﷺ-এর মাধ্যমে। আপনি আমাদের পানি দিতেন। এখন আমরা আমাদের নবী ﷺ-এর চাচার মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদেরকে পানি দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর পানি হতো।[৪]

সুধী পাঠক! কোনো মানুষ যেন শিরকী অসীলা ধরতে না পারে, সে বিষয়ে সকল নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম সোচ্চার ছিলেন। তারা সকলে শিরকের শিখণ্ডীগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর শুরু থেকেই প্রত্যেক নবী ও রাসূল আলাইহিমুস সালাম আপসহীনভাবে শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। প্রয়োজনে স্বীয় জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শিরকের সাথে সমোঝতা করেননি। যেমন নূহ আলাইহিস সালাম অলীদের নামে তৈরিকৃত মূর্তির সাহচর্য ত্যাগ করতে বলেছেন।[৫] মূসা আলাইহিস সালাম শিরককে প্রত্যাখ্যান করতে স্বীয় উম্মতকে নছীহত করেন।[৬] ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় বংশধরের তৈরিকৃত মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন।[৭] অনুরূপই মুহাম্মাদ ﷺ ও মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের মূর্তিগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেমনটি হাদীছে বিধৃত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُمِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِي يَدِهِ وَيَقُوْلُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ).

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৩৩৩, ৫৯৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১২৫; ছহীহুল জামে', হা/২৮৭০; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৪৭৯; মিশকাত, হা/৪৯৩৮।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৯৮৬; তিরমিযী, হা/৩৫০৬; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৬০; আহমাদ, হা/১০৬৯৬; ত্বাবারানী, হা/৯৮১; মিশকাত, হা/২২৮৭।

৩. আবূ দাঊদ, হা/১৪৯৩; তিরমিযী, হা/৩৪৭৫; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৫৭; আহমাদ, হা/২৩০১৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৮৯১; মিশকাত, হা/২২৮৯, সনদ ছহীহ।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১০১০; ইবনু হিব্বান, হা/২৮৬১; বায়হাক্বী কুবরা, হা/৬২২০; কানযুল উম্মাল, হা/৩৭২৯৬; আল-মুসনাদুল জামে', হা/১০৪৭৬; মিশকাত, হা/১৫০৯।

৫. সূরা নূহ, ৭১/২৩।

৬. সূরা আল-আ'রাফ, ৭/১৩৮; তিরমিযী, হা/২১০৬, সনদ ছহীহ।

৭. সূরা আছ-ছাফফাত, ৩৭/৯৩।

www.al-itisam.com

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, (মক্কা বিজয়ের দিন) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কা'বা ঘরের চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে এগুলোকে আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'সত্য এসেছে আর মিথ্যা অপসারিত হয়েছে। মিথ্যা তো ধ্বংস হওয়ারই' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৮১)*। 'সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে'।[৮]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মূর্তি ভাঙার জন্য এবং আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেন তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করা হয়'।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

আবুল হাইয়াজ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একদা আমাকে বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে যে জন্য পাঠিয়েছিলেন, আমি কি তোমাকে সে জন্য পাঠাব না? তিনি বলেছিলেন, 'তুমি কোনো মূর্তি না ভেঙ্গে ছেড়ে দিবে না এবং কোন উঁচু কবর ছেড়ে দিবে না, যতক্ষণ তা ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে না দিবে'।[১০]

عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّ أُنَاسًا يَأْتُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِيْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ

নাফে' (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এ মর্মে জানতে পারলেন যে, যে গাছের নিচে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়আত নিয়েছিলেন, ঐ গাছের কাছে মানুষ ভিড় করছে। তখন তিনি তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন।[১১] উল্লেখ্য, শয়তানের পরামর্শেই মূর্তি ও প্রতিকৃতি পূজার সূচনা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وُدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجُرُفِ عِنْدَ سَبَا وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لآلِ ذِي الْكَلاَعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মূর্তির পূজা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। 'ওয়াদ' দুমাতুল জান্দাল নামক জায়গায় কালব গোত্রের একটি দেবমূর্তি। 'সূওয়া'' হলো, হুযায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং 'ইয়াগূছ' ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরবর্তীতে তা গুতায়ফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল ক্বওমে সাবার নিকটবর্তী জাওফ নামক স্থান। 'ইয়াঊক্ব' ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, 'নাসর' ছিল যুলকালা' গোত্রের হিময়ার শাখার মূর্তি। এসব আসলে নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় সৎ লোকের নাম। তারা মারা গেলে শয়তান তাদের ক্বওমের লোকদের অন্তরে একথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন করো এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ করো। কাজেই তারা তাই করল, কিন্তু তখনো ঐসব মূর্তির পূজা করা হতো না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দেয়'।[১২]

তাই আমাদের উচিত, সব ধরনের অবৈধ অসীলা চিরতরের জন্য বর্জন করা। আর বৈধ অসীলা গ্রহণ করা। পাশাপাশি সকল প্রকার শিরক পরিহার করে খালেছ তাওহীদ ভিত্তিক আক্বীদা সুদৃঢ় করা। শিরকমুক্ত আক্বীদা পোষণ করে জান্নাতের পথিক হওয়া।

(চলবে)

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭২০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭২৫; তিরমিযী, হা/৩১৩৮; আহমাদ, হা/৩৫৮৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৫২২; ত্বাবারানী আওসাত্ব, হা/৩১৬।

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭; বায়হাক্বী কুবরা, হা/৪১৭৮।

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৮৭; আহমাদ, হা/৭৪১; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/১৩৬৬; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৫৩০; আল-মুসনাদুল জামে', হা/১০০৮১; মিশকাত, হা/১৬৯৬।

১১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/৭৫৪৫, ৭৬২৭; তাহযীরুস সাজেদ, পৃ. ৮৩।

১২. সূরা নূহ, ৭১/২৩; ছহীহ বুখারী, হা/৪৯২০; তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৮/২৩৫।

www.al-itisam.com

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

-মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান*

(পর্ব-৩)

ভুল ধারণা-৩ : আহলেহাদীছগণ ছাহাবীগণকে অমান্য করে এবং তাদের মানহানি করে :

আহলেহাদীছদের প্রতি তৃতীয় ভুল ধারণা হলো, আহলেহাদীছগণ ছাহাবীগণকে মানে না। তারা ছাহাবীদের কথা অস্বীকার করে এবং তারা তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে অপমান করে থাকে।

বাস্তবতা হচ্ছে, আহলেহাদীছদের নিকট ছহাবীগণ আক্বীদা এবং আমল উভয় ক্ষেত্রে আদর্শ ও দলীল।

১. আহলেহাদীছদের নিকট সৎপথ প্রাপ্ত আহলে হক্ব তারাই, যারা নবী ﷺ এবং ছাহাবীদের পথে চলে : আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً " قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

‘আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সকল দল জাহান্নামে যাবে’। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কোন দল? নবী ﷺ উত্তর দিলেন, ‘যে দলটি আমি এবং আমার ছাহাবীগণের আদর্শে অবিচল থাকবে’।[১]

আহলেহাদীছদের মতে নবী ও ছাহাবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর যুগের পরবর্তী মতানৈক্যের ব্যাপারে সময়ের সঠিক সমাধান এবং সত্যপন্থিদের পরিচয় লাভের মানদণ্ড হলো ছাহাবীগণ। যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সুন্নাহ এবং মানহাজের অনুসারী, তারাই মূলত আহলেহাদীছদের নিকটে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সকল ওলামায়ে কেরাম কুরআন এবং সুন্নাহর মূল বক্তব্যকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা প্রদান করে দলীল হিসাবে সাব্যস্ত করে মুসলিম উম্মাহর মাঝে নানা ধরনের বিদআত, অপসংস্কৃতি তৈরি করে, তাদের বক্তব্যকে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রেও আহলেহাদীছগণ ছাহাবীদের পদ্ধতি এবং মূলনীতিকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন। এ সকল দলীল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শুধু জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির মানুষ সর্বদা আহলেহাদীছদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ দিয়ে থাকে। কিন্তু দলীলবিহীন মিথ্যা অপবাদ নিজের গোঁড়ামির পক্ষেই দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

২. ছাহাবীগণের ব্যাপারে হানিকর বক্তব্য দানকারী নবী ﷺ-এর অভিশাপপ্রাপ্ত : আহলেহাদীছদের নিকটে ছাহাবীগণকে গাল-মন্দকারী, তাদের মর্যাদাহানিকারী, তাদের উপর থেকে উম্মতের নির্ভরতা হননকারী আল্লাহর অভিশাপের অধিকারী। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন ব্যক্তিকে অভিশপ্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

‘যারা আমার ছাহাবীগণকে গালিগালাজ করে, তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের লা‘নত’।[২]

৩. ছাহাবীগণ নবী ﷺ-এর বিপরীতে খুলাফায়ে রাশেদীনের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করতেন : সকল ছাহাবীর মর্যাদার স্থান এবং সম্মান স্বীকৃত। কিন্তু বড় হতে বড় ব্যক্তিও দলীলের উর্ধ্বে নয়। দলীলের প্রাধান্য সর্বদা ব্যক্তির উপরে হয়ে থাকে।

ছাহাবীগণের নিকট খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তারা তাদের আদেশ ও বিচার-ফয়সালা মান্য করতেন। কিন্তু ছাহাবীগণ নবী ﷺ-এর বক্তব্যের বিপরীতে বড় হতে বড় ব্যক্তিত্বের কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারা আকাবিরদের (বড়দের) অসম্মান করতেন না; কিন্তু তারা তাদের সম্মানের দোহায় দিয়ে তাদের বক্তব্যকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দান করতেন না।

উক্ত দলীলের উপর এক চমৎকার বর্ণনা আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর একটি বিচার-ফয়সালা এবং তার বিচার-ফয়সালার উপর আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর বক্তব্য হতে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. তিরমিযী, হা/২৬৪১।

২. ছহীহুল জামে‘, হা/৬২৮৫।

أُتِيَ عَلِيٌّ ﷺ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

‘একদা আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট কিছু ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদকে উপস্থিত করা হলো। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাদের সকলকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে যখন এই সংবাদ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, আমি যদি (আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্থানে) হতাম, আমি তাদের আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ করতাম না। কেননা আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইভাবে আগুনে পুড়াতে নিষেধ করেছেন। বরং আমি তাদেরকে আগুনে জ্বালানোর পরিবর্তে হত্যা করার আদেশ করতাম। কেননা আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন পরিবর্তন করল, তাকে হত্যা করো’।[৩] ভিন্ন এক বর্ণনায় রয়েছে, فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর এই বক্তব্য আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, ‘ইবনু আব্বাস সত্য বলেছেন’।[৪]

উক্ত ঘটনার মধ্যে এক দিকে যেমন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর সত্য বলার সাহসিকতার প্রমাণ রয়েছে, অপরদিকে আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সত্যকে অকপটে স্বীকার করা বা মেনে নেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ফয়সালার বিপরীতে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, যদি আমি হতাম, তাহলে এইরূপ বিচার করতাম না। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) একথা বলেননি যে, আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যা করেছেন, সে ব্যাপারে তার নিকট কোনো না কোনো দলীল তো আছেই। বরং যে সত্য তার নিকট ছিল, তার আলোকেই তিনি আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ফয়সালায় নিজের মত প্রকাশ করেছেন। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও তার এই কর্মপদ্ধতিকে ভুল, পথভ্রষ্টতা বা বেয়াদবী হিসাবে উল্লেখ করেননি। বরং পরিষ্কার ভাষায় তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর কথাকে সাদরে সত্যায়ন করেছেন।

৪. ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিপরীতে অন্য কারও বক্তব্যকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন না : এক্ষেত্রে আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মানহাজও একই ছিল। তিনিও ওই একই মূলনীতির অনুসারী ছিলেন। যত বড়ই ব্যক্তিত্ব হোক না কেন, তার কথা ও আমল নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলের বিপরীত হলে অগ্রহণযোগ্য বা অনুসরণযোগ্য নয়। তার একটি উদাহরণ ছহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। মারওয়ান ইবনে হাকাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন,

شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ﷺ وَعُثْمَانُ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ، أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ .

আমি উছমান ও আলী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-কে (উসফান নামক স্থানে) দেখেছি, ‘উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তামাত্তু‘ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করতে নিষেধ করতেন। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এ অবস্থা দেখে হজ্জ ও উমরার ইহরাম একত্রে বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেন- لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (হে আল্লাহ! আমি উমরা ও হজ্জের ইহরাম বেঁধে হাযির হলাম) এবং বললেন, শুধু কারও কথায় আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত বর্জন করতে পারব না।[৫]

আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহর বিপরীতে উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ফয়সালাকে গ্রহণ করেননি। উল্লিখিত দুটি বর্ণনায় ইবনে আব্বাস ও আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-এর আমল ও অনুসৃত পদ্ধতি দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং ছাহাবীগণ খুলাফায়ে রাশেদীনের নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো বক্তব্য বর্জন করতেন।

আহলেহাদীছদের মূলনীতি এটাই যে, সাধারণভাবে ছাহাবীগণের অনুসৃত মত দলীল, তবে তাদের কথার মাঝে যদি কখনো মতের ভিন্নতা দেখা যায়, তাহলে সে সময় ওই ছাহাবীর বক্তব্য প্রাধান্য পাবে, যার পক্ষে দলীল রয়েছে। আর কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে কারও কথাই গ্রহণ করা যাবে না।

উল্লিখিত দুটি ঘটনায় একথাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কখনো কখনো বড় বড় ছাহাবী পর্যন্তও নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো বাণী পৌঁছত না, যার কারণে তাদের বিপরীতে বিভিন্ন মতামত দেখা যেত। ফলে কল্যাণকামী হয়ে অন্য ছাহাবী তাকে সতর্ক করে দিতেন।

(চলবে)

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯২২।
৪. সুনানে তিরমিযী, হা/১৪৫৮।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৬৩।

www.al-itisam.com

সালাফী জামাআত বনাম ভ্রান্ত দলসমূহ

-মাহবূবুর রহমান মাদানী*

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সাথে আরও সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্ত্বেও যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল ছাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী মুমিনদের উপর।

সালাফ সম্পর্কে কিছু লিখার চেষ্টা করেছি, যাতে করে নিজে তা থেকে উপকার নিতে পারি এবং সম্মানিত পাঠকগণও উপকৃত হতে পারেন।

মানহাজ শব্দের অর্থ হলো- পথ, পন্থা, পদ্ধতি। আর সালাফ শব্দের অর্থ হলো- অতীত, অগ্রগামী, পূর্ববর্তী। সালাফ শব্দের দিকে সম্বন্ধ করে সালাফী বলা হয়। যেমন ইমাম মালেকের দিকে সম্বন্ধ করে মালেকী বলা হয়। সালাফী মানহাজ অর্থ হলো- পূর্ববর্তীদের পথ বা মতাদর্শ। পবিত্র কুরআনের ছয় জায়গায় সালাফ শব্দ এসেছে। যথা- সূরা আল-বাক্বারা, ২/২৭৫; আন-নিসা, ৪/২২, ২৩; আল-মায়েদা, ৫/৯৫; আল-আনফাল, ৮/৩৮ ও আল-যুখরুফ, ৪৩/৫৬। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ‘আমি ওদেরকে (ফেরআউন ও তার দলকে) পরবর্তীদের জন্য অতীত নমুনা ও দৃষ্টান্ত করে রাখলাম *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৫৬)*। স্বয়ং রাসূল ﷺ সালাফ শব্দ ব্যবহার করেছেন। একদা তিনি তাঁর মেয়ে ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা-কে বলেছিলেন, فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ ‘আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী’।[১] অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বে গমনকারী, তুমি পরে আমার কাছে আগমন করবে।

পরিভাষিক অর্থে,

أَنَّ مَفْهُوْمَ السَّلَفِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُرَادُ بِهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ وَالتَّابِعُوْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة

‘পরিভাষায় সালাফ বলতে সাধারণভাবে তিন সোনালি যুগের ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনকে বুঝায়’।[২]

যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ‘আর মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রগামী আর যারা তাদেরকে যাবতীয় সৎকর্মে (কথায়, কাজে ও আক্বীদায় একনিষ্ঠভাবে) অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো মহান সফলতা’ *(তাত-তাওবা, ৯/১০০)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ‘সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ। অতঃপর তার পরের যুগের। অতঃপর তার পরের যুগের। অতঃপর তাদের পর এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যাদের এক জনের শপথের আগে সাক্ষ্য হবে, আবার সাক্ষ্যের আগে শপথ হবে’।[৩]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে জানা গেল যে, রাসূল ﷺ-এর ছাহাবীগণ, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনকে প্রকৃতপক্ষে সালাফ বা অগ্রগামী দল বলা হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে তারাই ছিলেন উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এজন্য তাদেরকে বলা হয়, ‘আস-সালাফুছ ছালেহ’ বা নেক্কার অগ্রবর্তী দল। এর মাধ্যমে ‘আস-সালাফুত্ব ত্বলেহ’ তথা খারাপ অগ্রবর্তী দল বের হয়ে যায়। সালাফদের পথ হলো সর্বাধিক নিরাপদ, সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন, অত্যধিক সুস্পষ্ট এবং অধিক সুদৃঢ়, শক্ত ও মযবূত।

বর্তমান সালাফী কারা : বর্তমান সালাফী বলতে যারা কুরআন-হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে তা আক্বীদার বিষয় হোক বা আমলের বিষয় হোক সোনালি তিন যুগের লোকদের কর্মপদ্ধতি ও মতাদর্শের অনুসারী হবে, তারাই সালাফী বা আহলুস সালাফ নামে অবহিত হবেন। আহল অর্থ ধারক-বাহক ও অনুসারী অর্থাৎ যারা সালাফদের মতাদর্শ ধারণ ও অনুসরণ করেন, তারাই আহলুস সালাফ।

কেন আমরা সালাফী পরিচয় দিব? : যখন পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন বিদআতী দলের ছড়াছড়ি। যেমন খারেজী, শীআ-

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৮৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫০; মিশকাত, হা/৬১২৯।

২. মাওসূ‘আতুল ফিরাকিল মুনতাসিবাতি লিল ইসলাম, ১/১০২।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৩৩; মিশকাত, হা/৩৭৬৭।

www.al-itisam.com

রাফেযী, জাহমিয়্যা, মুতাযিলী, আশআরী, মাতুরিদী, ক্বাদারিয়্যা, জাবরিয়্যা, নকশাবান্দীয়া, দেওবান্দী, ব্রেলভী, ছূফী, পীর-মুরিদী আর তাদের সকলের দাবীই হলো সে মুসলিম। তখন সঠিক মতাদর্শের তথা তিন সোনালি যুগের লোকদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমের একটা সতন্ত্র পরিচয় থাকাটা একান্ত জরুরী। যাতে উক্ত সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত দলকে সকলের মাঝে সহজে চেনা যায়।

আহলুস সালাফ-এর সমার্থক নামসমূহ : অর্থের দিক দিয়ে এ সকল নামের মর্মার্থ এক ও অভিন্ন।

(১) আল-জামাআতুস সালাফিয়্যাহ : যেহেতু তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সালাফদের মানহাজকে অনুসরণ করেন, তাই তারা উক্ত নামে অভিহিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধরো এবং দলাদলি করো না' *(আলে-ইমরান, ৩/১০৩)*। জামাআতুস সালাফিয়্যাহ নাম আরব দেশসমূহে বেশি পরিচিত। জামাআত বলা হয় মানুষের ঐক্যবদ্ধ একটি দলকে। মূলত জামাআত বলতে হক্বের উপর ঐক্যবদ্ধ লোকদেরকে বুঝায়, সংখ্যা কম হোক বা বেশি হোক। যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন একাই একটি উম্মাত বা জামাআতের সমান *(আন-নাহল, ১৬/১২০)*। সংখ্যা বেশি হলেও যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত থেকে দূরে থাকে, তাদেরকে শরীআতের পরিভাষায় জামাআত বলা হয় না। এজন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতের সংজ্ঞায় বলেন, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর আছি, তার উপর যারা থাকবে তারাই জামাআত'।[৪]

(২) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত : ইমাম ইবনে তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হলো পুরনো মাযহাব, যা ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহিমাহুমুল্লাহ-কে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করার পূর্বেই পরিচিত ছিল।[৫] তিনি আরও বলেন, বিদআত যেমন বিচ্ছিন্নতার সাথে সংযুক্ত, তেমনি সুন্নাহ হলো জামাআতের সাথে সংযুক্ত।[৬] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবীগণ যার উপর ছিলেন তার উপর যারা আক্বীদায়, কথায় ও আমলে থাকবেন তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত।

(৩) আহলুল হাদীছ : যারা কুরআন ও সুন্নাহকে সালাফদের বুঝ অনুযায়ী বুঝেন, তারাই আহলুল হাদীছ। আল্লাহ তাআলা কুরআনকেও হাদীছ বলেছেন, অপরপক্ষে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কর্ম ও সমর্থনকেও হাদীছ বলা হয়। আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ 'আল্লাহ উত্তম হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন' *(আয-যুমার, ৩৯/২৩; মুরসালাত, ৭৭/৫০)*। ফলে উভয় অর্থ তাদের মধ্যে পাওয়ার কারণে তাদেরকে আহলুল হাদীছ বলা হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ ওই দুটি আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[৭] আহলুল হাদীছ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, মালদ্বীপ ও ইন্ডিয়াতে পরিচিত।[৮]

(৪) আল-জামইয়্যিতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ : যারা একমাত্র মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাকে সবার উপরে প্রাধান্য দেয়, নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব মানে না এবং বিদআতকে প্রশ্রয় দেয় না। উক্ত নাম পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, নেপাল, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশে বেশি পরিচিত।[৯]

(৫) আহলুল আছার : আছার অর্থ হাদীছ আবার ছাহাবীদের কথা ও কাজকেও আছার বলা হয়। যেহেতু তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে ও ছাহাবীদের পথকে আঁকড়ে ধরেন, তাই তারা উক্ত নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে'।[১০]

(৬) জামাআতু আনছারিস সুন্নাহ বা সুন্নাহর সাহায্যকারী দল : যারা একনিষ্ঠ তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত জামাআত মিসর, সিরিয়া, সুদান, মরক্কো, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড ও লাইবেরিয়াতে পরিচিত।[১১]

(৭) আত-ত্বয়িফাহ আল-মানছূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল : রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ 'আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল

৪. তিরমিযী, হা/২৬৪১; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩৪৮।
৫. মাজমূআ ফতওয়া, ৪/৯৫।
৬. আল-ইস্তিক্বামাহ, ১/৪২।
৭. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩।
৮. আল-মাওসূ'আতুল মুইয়াসসারাহ ফিল আদয়ান, ১/১৬৯।
৯. আল-মাওসূ'আতুল মুইয়াসসারাহ ফিল আদয়ান, ১/১৮২।
১০. ইবনু মাজাহ, হা/৪২; তিরমিযী, হা/২৮৯১।
১১. আল-মাওসূ'আতুল মুইয়াসসারাহ ফিল আদয়ান, ১/১৮২।

www.al-itisam.com

সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে। যারা তাদের (বিরোধিতা) অপমানিত করতে চায়, তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না'।[১২]

(৮) আল-গুরাবা : গুরাবা শব্দটি গরীব শব্দের বহুবচন। গরীব আরবী শব্দের অর্থ হলো অপরিচিত (মুসাফির) মানুষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ 'দ্বীন ইসলাম নিঃসঙ্গ অপরিচিত মুসাফিরের ন্যায় অল্প সংখ্যক লোক দ্বারা যাত্রা শুরু করেছিল, আবার সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব সেসকল অল্প সংখ্যক মুসাফির লোকদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে'।[১৩] অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে ইসলামের জয়যাত্রা অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে মদীনা থেকে শুরু হয়েছিল। ক্বিয়ামতের পূর্বে আবার একই অবস্থায় মদীনায় ফিরে যাবে।

(৯) আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ 'বনী ইসরাঈলরা (মূসা আলাইহিস সালাম-এর জাতিকে বনী ইসরাঈল বলা হয়) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এক দল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সে দল কোনটি (যারা জান্নাতে যাবে)? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর যারা থাকবে'।[১৪] তারা হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

সালাফী মানহাজের বা মতাদর্শের বিরোধী প্রধান কয়েকটি দলের পরিচয় : প্রত্যেক দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে আলোচনা করা হলো।

খারেজী সম্প্রদায় : তাদেরকে হারূরীও বলা হয়। হারূরা নামক স্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে হারূরী বলা হয়। হারূরা ইরাকের একটি গ্রামের নাম। এদের আরো নাম রয়েছে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ ত্যাগ করে তারা উক্ত গ্রামে একত্রিত হয়েছিল। তারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে, তাদেরকে কাফের বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে ও তাদের জান-মাল হালাল করে নিয়েছে। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করেছিল। তারা সাধারণ গুনাহকারী মুসলিমকে কাফের বলে। আর কাবীরা গুনাহকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাহলে তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে মত দেয়। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে লড়াই করেছেন।

শীআ ও রাফেযী দল : শীআ অর্থ- দল, সম্প্রদায় ও ভক্তবৃন্দ। শীআরা নিজেরা দাবী করে যে, তারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুসারীবৃন্দ। রফয আরবী শব্দ, অর্থ হলো বর্জন করা, পরিত্যাগ করা। শীআদেরকে রাফেযী বলা হয়। কারণ তারা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, আপনি আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম উচ্চারণের পর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলা পরিত্যাগ করুন। তখন তিনি বললেন, এরূপ করা থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এতে তারা তাকে বর্জন করল। সেখান থেকেই তাদেরকে রাফেযী বা পরিত্যাগকারী দল বলা হয়। তারা আলী ইবনে আবূ তালেব এবং আহলে বায়তের ফযীলতের ব্যাপারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাদেরকে অন্যান্য ছাহাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এমনকি বাকী সব ছাহাবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তারা তিন খলীফা আবূ বকর, উমার, উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর খেলাফতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদেরকে শত্রু মনে করে ও গালি দেয়। পাঁচ জন ছাহাবী যেমন আলী, মিক্বদাদ, আবূ যার, সালমান ফারেসী ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুম বাদে সবাইকে কাফের মনে করে। শীআরা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করে না। তারা হাদীছের কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের ধারণা মতে এর রাবীগণ কাফের।

মুতাযিলা দল : ওয়াছিল ইবনে আতার অনুসারীদেরকে মুতাযিলা বলা হয়। মুসলিমদের কেউ কাবীরা গুনাহতে পতিত হলে তার বিধান কী হবে, উক্ত বিষয়ে তার মাঝে এবং তাবেঈ হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ-এর মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণে ওয়াছিল ইবনে আতা হাসান বাছরীর মজলিস ত্যাগ করেছিল। অতঃপর ওয়াছিলের অনুসারীরাও হাসান বাছরীর দারস ত্যাগ করে তার সাথে যোগ দেয়। এতে হাসান বাছরী বলেছিলেন, ওয়াছিল আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। এ থেকে তাদেরকে মুতাযিলা বলা হয়। ই'তিযাল থেকে মুতাযিলা অর্থ হলো পরিত্যাগ করা। তারা কাবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বলে যে, সে উক্ত গুনাহ করার কারণে ঈমান থেকে বাহির হয়ে গেছে এবং কুফরীতে প্রবেশ করেনি, বরং সে দুয়ের মাঝে অবস্থান করছে। তবে তারা তাকে ফাসেক্ব বলেছে। তাদের নিকট ফাসেক্বের ব্যাখ্যা হলো, দুয়ের মাঝের অবস্থান। তারা আল্লাহর সকল ছিফাত বা গুণকে অস্বীকার করে। তারা

১২. তিরমিযী, হা/২১৯২।
১৩. তিরমিযী, হা/২৬২৯; মিশকাত, হা/১৬২।
১৪. ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৯৩; তিরমিযী, হা/১৫৪০; মিশকাত, হা/১৬৩।

কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে না; বরং তারা কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি বলে।

জাহমিয়্যা দল : তাদের ইমাম জাহম ইবেন ছফওয়ানের দিকে সম্বন্ধ করে জাহমিয়্যা সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে। তাকে উমাইয়া খলীফার শেষ যুগে খুরাসানের আমীর সালামা বা সালাম ইবনে আহওয়ায হত্যা করেন। তারা আল্লাহর নাম ও তার গুণাগুণকে পবিত্র করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করেছে। তারা বলে, আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাগুণকে সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই তারা আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণাগুণকে বাতিল ও অস্বীকার করে। এ কারণে তাদেরকে মু'আত্তিলা বা আল্লাহর নাম ও ছিফাতকে বাতিলকারী দলও বলা হয়। তারা বলে, পরকালে আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে না এবং তিনি বান্দার সাথে কথাও বলবেন না। অন্যদিকে মুশাব্বিহা সম্প্রদায় আল্লাহর গুণাগুণকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। তারা আল্লাহর গুণাগুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করেছে। এজন্য তাদেরকে মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্য প্রদানকারী দল বলা হয়।

জাবরিয়্যা দল : জাবর শব্দের দিকে সম্বন্ধ করে তাদের জাবরিয়্যা নাম রাখা হয়েছে। তারা বলে, বান্দা তার কর্মের উপর বাধ্য। তার কোনো স্বাধীনতা নেই। তাদের ধারণায় আল্লাহ তাআলাই একমাত্র কর্তা এবং বান্দার কর্মও আল্লাহই করেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। বান্দার কর্মগুলো বান্দার দিকে রূপক অর্থেই সম্বন্ধ করা হয়।

ক্বাদারিয়্যা দল : ক্বদর শব্দের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে ক্বাদারিয়্যা বলা হয়। তারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। তারা জাহমিয়্যা সম্প্রদায়ের বিপরীত। তারা বলে যে, বান্দাই তার নিজের কর্মের স্রষ্টা। তাদের ধারণায় বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন নয়। বরং বান্দারা নিজেদের ইচ্ছামতোই তাদের কর্মসমূহ সম্পাদন করে। তারা আল্লাহর ইলম বা জ্ঞানকে অস্বীকার করে। তারা বলে, আল্লাহ তাঁর বান্দার কর্ম সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা জানেন না; বরং উক্ত কর্ম সম্পাদনের পর জানেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

মুরজিআ দল : ইরজা শব্দের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে মুরজিআ বলা হয়। ইরজা আরবী শব্দ, অর্থ হলো পিছিয়ে দেওয়া বা বের করে দেওয়া। তাদের নিকট অন্তরে শুধু বিশ্বাস করার নাম ঈমান। তারা আমলকে ঈমান থেকে বের করে দেয় এবং আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তাই তাদেরকে মুরজিআ বলা হয়। তারা মনে করে, কাবীরা বা বড় গুনাহর কাজে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসেক্ব নয়। কাফের অবস্থায় সৎকাজ করলে তা যেমন কোনো উপকারে আসে না, তদ্রূপ ঈমান ঠিক থাকলে গুনাহর কাজে পতিত হলে তা ঈমানের কোনো ক্ষতি করে না। ফলে তাদের নিকট কাবীরা গুনাহের কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার। এমনকি সে শাস্তিরও সম্মুখীন হবে না। তাদের মতে আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বড়ে না এবং পাপাচারের মাধ্যমে কমে না।

উল্লিখিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হলো, খারেজী-রাফেযী ও জাহমিয়্যা। তবে মুরজিআ দল তাদের তুলনায় কম ক্ষতিকর। আশাআরিয়া ও মাতুরিদিয়্যারা মুরজিআ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারা ঈমানের সংজ্ঞা থেকে যবানের দ্বারা স্বীকারোক্তি, অন্তরের আমল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে বাহির করে দিয়েছে। শুধু অন্তরে স্বীকৃতি দেওয়াকে ঈমান বলে।

[উল্লিখিত ভ্রান্ত দলগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যা, শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান, পৃ. ৯৪-৯৬।]

উল্লিখিত বিদআতী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আহলুস সালাফদের অবস্থান : আহলুস সালাফদের অবস্থান হচ্ছে মধ্যমপন্থা। (১) তারা আল্লাহর নাম ও গুণকে সাব্যস্ত করেন এবং সৃষ্টির সাথে তুলনা করেন না (২) আল্লাহর আরশের উপর অবস্থানকে স্বীকার করেন (৩) তারা কোনো মুসলিমকে তার কোনো কাবীরা গুনাহের কারণে কাফের বলেন না; বরং তারা বলেন যে, সে অপরাধী ও শাস্তির হক্বদার। তওবা না করে মারা গেলে পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে। (৪) তাদের নিকট ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও অঙ্গ-পত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল এবং আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে ও খারাপ কর্মের দ্বারা ঈমান কমে। (৫) তারা সকল ছাহাবীকে ভালোবাসেন এবং মনে করেন যে, ছাহাবীরা এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। (৬) তারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করেন। (৭) তারা কুরআন ও সুন্নাহকে তিন সোনালি যুগের লোকের বুঝ অনুযায়ী বুঝেন এবং (৮) তারা দলাদলি ও মতভেদের সময় কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেন। এজন্য তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলা হয়।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে হক্বের পথে পরিচালিত করেন এবং বিদআতী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করেন- আমীন!

‘মূর্তি বিড়ম্বনার ইসলামি আঙ্গিক’ শীর্ষক প্রবন্ধের পর্যালোচনা

-আহমাদুল্লাহ*

ভূমিকা : সম্প্রতি ভাস্কর্য নিয়ে আবারও বিতর্ক উঠেছে। কিছু মানুষ দাবী করছেন যে, ভাস্কর্য তৈরি করা যাবে। এমনকি দরবারী কিছু আলেম (?)ও বলছেন যে, ভাস্কর্য রাখা যাবে। ইতোপূর্বে লিলিয় সুপ্রিম কোর্টের মূল ভবনের সামনে লিলি ফোয়ারায় স্থাপিত ভাস্কর্য রাখা ইসলামে জায়েয বলে এক ভদ্রলোক দাবী করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যেটি তৎকালীন সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় আমরা সেটির জবাব লিখতে অগ্রসর হই। বর্তমানে আবারও এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে বিধায় সেটি পত্রস্থ করা হলো।-

‘হাসান মাহমুদ’ নামের ভদ্রলোকটির বক্তব্যের মর্ম হলো, ‘সুপ্রিম কোর্টের মূল ভবনের সামনে লিলি ফোয়ারায় স্থাপিত ভাস্কর্যটি রাখা ইসলামসম্মত। সুতরাং এটা নিয়ে প্রতিবাদ করার কিছু নেই’।

জবাব : বিনীতভাবে জানাতে চাই, হাসান সাহেবের উক্ত দাবী সঠিকের নিকটবর্তীও নয়। তার বক্তব্যসমূহের পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

১. তিনি বলেছেন, ‘দেশে এখন মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে উত্তেজনা চলছে’।

জবাব : উত্তেজনা আর প্রতিবাদ করা এক নয়। তার কথানুপাতে, উত্তেজনা (?) হবার কারণ দুটি-

(ক) এটা ইসলাম বিরোধী কাজ। তাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামপন্থি জনসাধারণ একে মেনে নিতে না পারায় কিছুটা উত্তেজনা (?) হতেই পারে। যদিও তারা শান্তিপূর্ণভাবেই এর প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন।

(খ) এটা সংবিধান বিরোধী। কারণ সংবিধানে আছে, ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম...’।[১]

যেহেতু ইসলামে এভাবে ভাস্কর্য তৈরি করা হারাম, সেহেতু বাংলাদেশের ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ মোতাবেক এভাবে কোনো মূর্তি-ভাস্কর্য রাখা বৈধ নয়।

২. হাসান মাহমুদ সাহেব লিখেছেন, ‘বিষয়টির সঙ্গে হেফাজতিরা ইসলামকে জড়িয়ে ফেলেছে’।

জবাব : ইসলামকে জড়িয়ে ফেলেছে। কারণ এটা ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়াও শুধু হেফাজতে ইসলাম নয়; বরং দেশের সর্বস্তরের আলেম, ধর্মপ্রাণ মুসলিম একে বর্জন করেছেন।

৩. হাসান মাহমুদ সাহেব লিখেছেন, ‘তাই চলুন আমরা সূত্র ধরে দেখি এ ব্যাপারে কোরান, হাদিস, সিরাত (ইবনে হিশাম ইবনে ইবনে ইসহাক), তারিখ আল তারারি ও অন্যান্য দলিল কী বলে’।

জবাব : বাস্তবে তিনি কোনো আয়াত, হাদীছের আরবী পাঠ প্রদান করতে সক্ষম হননি। স্রেফ কিছু অনুবাদ পেশ করেছেন। হয়তো তিনি আরবী ভাষায় অজ্ঞ হবার কারণেই এমনটা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় অজ্ঞ হলে ইসলামের কোনো বিষয়ে মতামত প্রদান করা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তার পরবর্তী লেখনীই এর প্রমাণ। তিনি বলেছেন, ‘তারিখ আল-তারারি’। বাস্তবে এ নামে কোনো গ্রন্থ বিশ্বের বুকে নেই। সঠিক হলো ‘তারীখুত তবারী’ (তারীখে তবারী)। যেটি ইমাম ইবনে জারীর আত-তবারী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) আরবী ভাষায় রচনা করেছেন। যিনি গ্রন্থের নাম লিখতেই ভুল করেন, তিনি কেন এ বিষয়ে লিখতে মনস্থ করলেন তা বোধগম্য নয়।

৪. হাসান সাহেব লিখেছেন, ‘প্রথমেই তিনটে শব্দ বুঝে নেওয়া যাক: প্রতিমা, ভাস্কর্য ও মূর্তি। প্রতিমা হল মানুষ যার আরাধনা উপাসনা করে, ইহকালে-পরকালে মঙ্গল চায়, ভুলের ক্ষমা চায় ইত্যাদি। ভাস্কর্য্য হল মানুষসহ কোনো প্রাণী বা কোনো কিছুর মূর্তি যাকে মানুষ রাখে সম্মান দেখতে বা সৌন্দর্য্য বর্ধন করতে, যার মানুষ আরাধনা বা উপাসনা করে না’।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. বাংলাদেশের সংবিধান (মেট্রো পাবলিকেশন্স, ঢাকা), পৃ. ৯।

জবাব : 'প্রথমেই তিনটে শব্দ বুঝে নেওয়া যাক'- হাসান সাহেব! আপনার বুঝ দয়া করে আপনার কাছেই রাখুন। আপনার বুঝ দিয়ে তো হালাল-হারাম প্রমাণিত হবে না। হালাল বা হারাম প্রমাণিত হবে ইসলাম দিয়ে। সুতরাং আপনার নিজস্ব বুঝ অন্যদের উপর চাপানোর কোনোই দরকার নেই।

আসলে তিনি সংজ্ঞার মারপ্যাঁচে পড়েছেন। সংজ্ঞা হিসেবে যেটাই প্রদান করা হোক না কেন, সবই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। স্রেফ প্রদর্শনীর জন্য হলেও কোনো মানুষের ভাস্কর্য বানানো হারাম, সম্মান প্রদর্শন করা তো বহু দূরের কথা। এমনকি ঠেস দিয়ে বসার জন্য ছবিযুক্ত কাপড় দিয়ে কুশন বানানোও হারাম। অথচ এতে ছবির সুস্পষ্ট অবমাননা হয়। আমাদের এই প্রবন্ধের আসন্ন আলোচনায় এ বিষয়ে দলীলসহ আলোকপাত করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

৫. হাসান সাহেব লিখেছেন, 'এবারে অন্যান্য দলিলের দিকে তাকানো যাক, সেখানে আমরা দেখব হযরত মুহাম্মদের (সা.) বাড়িতে মূর্তি ছিল তাঁর সম্মতিক্রমেই'।

জবাব : ভাইজান! দয়া করে কোথাও তাকানোর দরকার নেই। চারপাশে বেশি নযর দিলে চোখের বারোটা বাজবে। তখন আকাশকে মাটি মনে হবে আর মাটিকে মনে হবে আকাশ। নারীকে পুরুষ দেখবেন আর পুরুষকে নারী। সুতরাং এতো তাকাতে হবে না।

আসলে এখানে তিনি ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। না বুঝেই তিনি একে দলীল (?) হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দলীল কী জিনিস এবং কীভাবে তার প্রয়োগ করতে হয় তা সম্পর্কে তার ন্যূনতম জ্ঞান নেই, যেটা আমরা সামনে দেখতে পাবো।

তিনি কতিপয় দলীল পেশ করেছেন। যদিও সেগুলোর সঠিক মর্ম বুঝতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। নিম্নে আমরা সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করলাম-

"দলীল-১ : (ক) সহি বুখারি ৮ম খন্ড হাদিস ১৫১ :

আয়েশা বলিয়াছেন, আমি রাসুলের (সা.) উপস্থিতিতে পুতুলগুলি লইয়া খেলিতাম এবং আমার বান্ধবীরাও আমার সহিত খেলিত। যখন আল্লাহর রাসুল (সা.) আমার খেলাঘরে প্রবেশ করিতেন, তাহারা লুকাইয়া যাইত, কিন্তু রাসুল (সা.) তাহাদিগকে ডাকিয়া আমার সহিত খেলিতে বলিতেন'।

দলীল-২ : (খ) সহি আবু দাউদ বুক ৪১ হাদিস নং ৪৯১৪ :

বিশ্বাসীদের মাতা আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন, যখন আল্লাহর রাসুল (সা.) তাবুক অথবা খাইবার যুদ্ধ হইতে ফিরিলেন তখন বাতাসে তাঁহার কক্ষের সামনের পর্দা সরিয়ে গেলে তাঁহার কিছু পুতুল দেখা গেল। তিনি [(রাসুল (সা.)] বলিলেন, 'এইগুলি কী?' তিনি বলিলেন, 'আমার পুতুল'। ওইগুলির মধ্যে তিনি দেখিলেন একটি ঘোড়া যাহার ডানা কাপড় দিয়া বানানো হইয়াছে এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহা কি যাহা উহার উপর রহিয়াছে?' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'দুইটি ডানা'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডানাওয়ালা ঘোড়া?' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'আপনি কি শোনেননি যে সুলেমানের ডানাওয়ালা ঘোড়া ছিল?' তিনি বলিয়েছেন, 'ইহাতে আল্লাহর রাসুল (সা.) এমন অট্টহাসি হাসিলেন যে আমি উনার মাড়ির দাঁত দেখিতে পাইলাম'।

দলীল-৩ : (গ) সহি মুসলিম বুক ০০৮, নং ৩৩১১ :

আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন যে আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁহাকে সাত বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন (যদিও অন্য রেওয়াতে আমরা পাই ছয় বছর : হাসান মাহমুদ) এবং তাঁহাকে নয় বৎসর বয়সে কনে হিসেবে তাঁহার বাসায় লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাঁহার পুতুলগুলি তাঁহার সাথে ছিল এবং যখন তিনি দেহত্যাগ করিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল আঠারো।

দলীল-৪ : (ঘ) সহি মুসলিম বুক ০৩১ নং ৫৯৮১ :

আয়েশা (রা.) বলিয়াছেন যে তিনি আল্লাহর রাসুলের (সা.) উপস্থিতিতে পুতুল লইয়া খেলিতেন এবং যখন তাঁহার সঙ্গিনীরা তাঁহার কাছে আসিত তখন তাহারা চলিয়া যাইত। কারণ তাহারা আল্লাহর রাসুলের (সা.) জন্য লজ্জা পাইত। যদিও আল্লাহর রাসুল (সা.) তাহাদিগকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন।"

জবাব :

প্রথমত : এটা ছিল খুবই সীমিত পরিসরে ছোট বাচ্চার জন্য, বিশেষ করে মেয়ে শিশুর জন্য এবং তা ছিল তুলা বা কাপড়ের তৈরি। পুরোপুরি মানুষের অবয়ব তাতে দৃশ্যমান ছিল না। আজও গ্রামবাংলার শিশুদেরকে কাপড়ের তৈরি পুতুল দিয়ে খেলতে দেখা যায়, যাতে মানুষের মতো মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা কোনো কিছুই স্পষ্ট থাকে না। কোথায় বর্তমান যুগের এসব মূর্তি-ভাস্কর্য আর কোথায় ন্যাকড়ার তৈরি সেই পুতুল?!

দ্বিতীয়ত : আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে অনুমতি দেওয়ার ঘটনাটি ছবিমূর্তি নিষিদ্ধ হওয়ার এবং এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার সাধারণ নির্দেশের পূর্বের ঘটনা বলে একদল আলেম মত দিয়েছেন। এ কারণে পরবর্তীতে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কোনো নাতী-নাতনীকে এসব খেলতে অনুমতি দিয়েছেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নিজেও বড় হয়ে কোনো বাচ্চাকে এভাবে পুতুল বানিয়ে খেলার অনুমতি দিয়েছেন মর্মে প্রমাণ নেই।

তৃতীয়ত : বাচ্চাদের হাত দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী পুতুল আর জনগণের রক্ত পানি করা উপার্জনের টাকায় নির্মিত লক্ষ-কোটি টাকা দামের মূর্তি কখনোই এক নয়।

চতুর্থত : ইসলামে অপচয় করা হারাম। আর এভাবে মূর্তি-প্রতিমা বানালে ব্যাপক টাকার অপচয় হয়। সময়ের অপচয় তো হয়ই। অন্যদিকে শিশুরা খেলনার পুতুল বানিয়ে খেললে এর জন্য কোনো টাকার অপচয় হয় না।

পঞ্চমত : স্বয়ং আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নিজেই এর বিরোধিতা করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন-

হাদীছ-১ : রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের বাড়িতে ছবিযুক্ত কোনো বস্তুই রাখতেন না। দেখলেই তা ভেঙে চূর্ণ করে দিতেন।[২]

হাদীছ-২ : আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, একবার তিনি একটি কুশন খরীদ করলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ করলাম। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি গুনাহ করেছি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই কুশন কেন? আমি বললাম, আপনার বসার জন্য ও বালিশ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এটি কিনেছি। তখন তিনি বললেন এই সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে ও তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তাতে জীবন দাও। অতঃপর তিনি বললেন, যে গৃহে (প্রাণীর) ছবিসমূহ থাকে, সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[৩]

হাদীছ-৩ : আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য বালিশ বানালাম, যাতে ছবি ছিল এবং দেখতে কুশনের মতো মনে হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে দুই দরজার মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর চেহারা (রাগে) পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি বললাম, আমার কী দোষ হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি বললেন, এই বালিশ কেন? আমি বললাম, এই বালিশ আপনার জন্য বানিয়েছি, যাতে আপনি এতে শয়ন করতে পারেন। তিনি বললেন, তুমি কি জানো না যে, ওই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে? আর যে ব্যক্তি ছবি বানায়, তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং আল্লাহ বলবেন, তুমি যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে জীবন দাও।[৪]

হাদীছ-৪ : আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা টাঙিয়েছিলেন, যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্দাটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) সেই কাপড়ের টুকরা দিয়ে কুশন তৈরি করেন, যা ঘরেই থাকত এবং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন।[৫]

হাদীছ-৫ : রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা এক সফর থেকে ঘরে ফেরেন। ওই সময় আমি দরজায় একটি পশমী কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছিলাম, যাতে ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি ছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং আমি পর্দাটিকে সরিয়ে দিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত পর্দাটিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের এই নির্দেশ দেননি যে, আমরা পাথর বা ইটকে কাপড় পরিধান করাই। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, অতঃপর আমি ওটা কেটে দুটি বালিশ বানাই ও তাতে খেজুর গাছের খোসা দিয়ে ভর্তি করে দিই। এতে তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।[৬]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫২।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬১।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩২২৪।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৭৯।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৭।

পোশাক ও বর্তমান পরিস্থিতি : একটি পর্যালোচনা

-সাজ্জাদ সালাদীন*

ইসলামে পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের সতর আবৃত করা এবং দেহ সজ্জিত করার মাধ্যম। এর দ্বারা লজ্জা নিবারণের পাশাপাশি এটা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। সাধারণত পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রকৃতি অনুভব করা যায়। আমাদের দেশে বর্তমানে 'সুন্নাতী লেবাস' বলে এক ধরনের বিশেষ কাটিং ও বিশেষ পরিমাণের লম্বা কোর্তা পরিধান করা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে যে, এটাই হচ্ছে সুন্নাতী পোশাক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সুন্নাতী পোশাক বলতে কী বোঝায়? কোনো বিশেষ কাটিং বা বিশেষ লম্বা মাপের জামা পরা কি সত্যিই সুন্নাত? সে সুন্নাত কোন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো? কুরআন থেকে? হাদীছ থেকে? আসুন! কুরআন ও হাদীছের আলোকে আমরা বিষয়টিকে বুঝার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

পোশাকের গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যেসব নেয়ামত দান করেছেন, পোশাক তার মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাক্বওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম। ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আল-আ'রাফ, ৭/২৬)*। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পোশাক মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ দান।

অতএব পোশাক সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সে পোশাক কী রকমের হতে হবে, সে বিষয়ে এ আয়াত থেকে দুটি কথা জানতে পারা যায়। একটি হলো, পোশাক এমন হতে হবে, যা অবশ্যই মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে। যে পোশাক মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে না, তা মানুষের পোশাক হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা হলো, সে পোশাককে 'ভূষণ' হতে হবে। অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চাকচিক্য, শোভাবর্ধক হতে হবে। সুন্দর পোশাক পরিধান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ .قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ انَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললেন, মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতা সুন্দর হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো হক্বকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[১]

পোশাকের প্রকারভেদ :

ইসলামী শরীআতে পোশাক তিন প্রকার। যথা- ওয়াজিব, মুস্তাহাব ও হারাম।

ওয়াজিব পোশাক : যে পোশাক সতর আবৃত করে, গরম ও শীত থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং ক্ষতি থেকে দেহকে হেফাযত করে, সে পোশাক ওয়াজিব।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

বাহয ইবন হাকীম রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের আবরণীয় অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখব এবং কার সামনে অনাবৃত করতে পারি? তিনি বললেন, 'তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো'। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক লোক যখন পরস্পর একসাথে থাকে? তিনি বলেন, 'যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়'। রাবী

* এম. এ., ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১; আবূ দাঊদ, হা/৪০৯২; তিরমিযী, হা/১৯৯৯; মিশকাত, হা/৫১০৮।

বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি বলেন, 'লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চাইতে বেশি হক্বদার'।[২]

মুস্তাহাব পোশাক : বিভিন্ন ইবাদতের সময়, জুমআ, দুই ঈদ ও জনসমাবেশে সুন্দর পোশাক পরার গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ 'তোমাদের কারও সামর্থ্য থাকলে সে যেন তার পেশাগত কাজে ব্যবহৃত পোশাক ব্যতীত জুমআর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক তৈরি করে'।[৩]

হারাম পোশাক : বিভিন্ন কারণে ইসলামে কতিপয় পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

(১) পুরুষের জন্য মহিলাদের পোশাক।

(২) মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোশাক।

(৩) খ্যাতি বা প্রসিদ্ধির পোশাক।

(৫) ভিন্ন ধর্মীয় বা বিজাতীয় পোশাক।

(৬) আঁটসাঁট পোশাক ও পাতলা কাপড়।

(৭) ছবি বা ধর্মীয় প্রতীক সম্বলিত পোশাক।

(৮) যে পোশাক পরলেও উলঙ্গ মনে হয়।

পুরুষের পোশাকের শর্তাবলি : পুরুষদের লেবাস বা পোশাকের শর্তাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো-

(১) লেবাস যেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ অবশ্যই আবৃত রাখে। যেহেতু ঐটুকু অঙ্গ পুরুষের লজ্জাস্থান।[৪]

(২) এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের চামড়া নযরে আসে।

(৩) এমন আঁটসাঁট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ফুটে ওঠে।

(৪) কাফেরদের লেবাসের অনুকৃত না হয়।

(৫) মহিলাদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

(৬) জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়।

(৭) পরিহিত লেবাস (পায়জামা, প্যান্ট, লুঙ্গি, কামীছ প্রভৃতি) যেন পায়ের গোড়ালির নিচে না যায়। মহানবী ﷺ বলেন, 'গোড়ালির নিচের অংশ লুঙ্গি জাহান্নামে'।[৫]

অর্থাৎ অহংকারমুক্ত সুন্দর ও ভদ্রতা-মার্জিত ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা একজন পুরুষের জন্য আবশ্যক।

মহিলাদের পোশাকের শর্তাবলি : মহিলাদের পোশাকের শর্তাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো-

(১) লেবাস যেন দেহের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে। দেহের কোনো অঙ্গ বা সৌন্দর্য যেন কোনো বেগানা (যার সাথে কোনোও সময়ে বিবাহ বৈধ নয় এমন) পুরুষের সামনে প্রকাশ না পায়। কেননা মহানবী ﷺ বলেন, 'মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তোলে'।[৬]

(৩) লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নযরে আসে। নচেৎ ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভুক্ত।[৭]

(৪) পোশাক যেন এমন আঁটসাঁট (টাইট ফিট) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ফুটে ওঠে। কারণ এমন ঢাকাও খোলার পর্যায়ভুক্ত এবং দৃষ্টি-আকর্ষী।

(৫) পোশাক যেন কোনো কাফের মহিলার অনুকৃত না হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাসে-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে সে তাদেরই দলভুক্ত'।[৮]

(৬) তা যেন পুরুষদের পোশাকের অনুরূপ না হয়। মহানবী ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।[৯] তিনি সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে মহিলার মতো পোশাক পরে এবং সেই মহিলাকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষের মতো লেবাস পরে।[১০]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

২. আবূ দাঊদ, হা/৪০১৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৯২০; তিরমিযী, হা/২৭৬৯।
৩. আবূ দাঊদ, হা/১০৭৪; ইবনু মাজাহ, হা/১০৯৬।
৪. ছহীহুল জামে', হা/৫৫৮৩।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৮৭; মিশকাত, হা/৪৩১৪।
৬. তিরমিযী, হা/১১৭৩; মিশকাত, হা/৩১০৯।
৭. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হ/৩৩৮৩; মিশকাত, হা/৪৩৭৫।
৮. আবূ দাঊদ, হ/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭।
৯. আবূ দাঊদ, ৪০৯৭; ইবনে মাজাহ, হা/১৯০৪।
১০. আবূ দাঊদ, ৪০৯৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৯০৩।

পাপ ও তওবার মাঝে বান্দার অবস্থান কেমন হওয়া উচিত

*[১৯ রবীউছ ছানী, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ৪ ডিসেম্বর, ২০২০। পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আব্দুল বারী আছ-ছুবায়তী (হাফি.)**। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত মুহাদ্দিছ ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর গবেষণা সহকারী **শায়খ আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুতবা

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি অন্তরসমূহকে করেছেন প্রশস্ত এবং হৃদয়সমূহকে করেছেন প্রশান্ত। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই পূত-পবিত্র সত্তার যিনি অপরাধীকে তওবা করে তার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দেন। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক তার কোনো শরীক নেই। যিনি বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের নেতা, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের উপর পরিচালিত করেছেন। চিরশান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি এবং তার সম্মানিত পরিবার ও ছাহাবীদের প্রতি।

আম্মা বা'দ : আমি আপনাদের সকলকে সেইসাথে নিজেকে তাক্বওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। যেই তাক্বওয়ার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং তোমরা প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না' *(আলে-ইমরান, ৩/১০২)*। নবী ﷺ-এর পথ কল্যাণের ঝরনাধারা, আলোর বারিধারা ও জীবন প্রদীপের ন্যায়। যা ভুল-পদস্খলনের সময়ও আপনাকে সঙ্গ দেয়।

পাপীর সাথে আল্লাহর আচরণের দৃষ্টান্ত :

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'বান্দা পাপ করে অতঃপর বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি পাপ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন প্রতিপালক বললেন, আমার বান্দা কি একথা জানে যে তার একজন প্রতিপালক রয়েছে, যিনি পাপ ক্ষমা করে দেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? (ঠিক আছে) আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চান বান্দা পাপ থেকে বিরত থাকে। তারপর আবার পাপে জড়িয়ে যায়। তখন আবার সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আরেক পাপ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন প্রতিপালক বললেন, আমার বান্দা কি একথা জানে যে তার একজন প্রতিপালক রয়েছে, যিনি পাপ ক্ষমা করে দেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? (ঠিক আছে) আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চান বান্দা পাপ থেকে বিরত থাকে। তারপর আবার পাপে জড়িয়ে যায়। তখন আবার সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আরেক পাপ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন প্রতিপালক বললেন, আমার বান্দা কি একথা জানে যে তার একজন প্রতিপালক রয়েছে, যিনি পাপ ক্ষমা করে দেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? (ঠিক আছে) আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দিলাম। এরকম তিনবার বললেন। সে যা ইচ্ছা করুক না কেন'।[১]

উল্লিখিত হাদীছটি পাপের সাথে ও বান্দার অবস্থান কী এবং পাপীদের ক্ষেত্রে ইসলাম নীতির সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছে। আমরা প্রত্যেকেই পাপী। কিন্তু উক্ত হাদীছটি আমাদের আশার দ্বারকে উন্মুক্ত করে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক পাপীর জন্য আল্লাহর সর্বব্যাপী রহমত, বন্ধুদের জন্য তাঁর প্রতিদান এবং বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের একটি চিত্র তুলে ধরেছে।

উক্ত হাদীছটি আরম্ভ হয়েছে যে, 'নিশ্চয় বান্দা পাপ করে' বাক্য দ্বারা। মানুষের স্বভাব হলো, সে জেনে না জেনে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পাপ করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ইবলীস তার রবকে বলেছে, আপনার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম! আমি আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করতেই থাকব যতক্ষণ তাদের মধ্যে রূহ থাকে। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলেন, আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম! আমি তাদের ক্ষমা করতে থাকব যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে'।[২]

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫০৭; মিশকাত, হা/২৩৩৩।
২. মুসনাদে আহমাদ, হা/১১২৫৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/১০৪।

বান্দা বলে, 'আমি পাপ করে ফেলেছি' পাপের স্বীকৃতি বান্দার বীরত্বের পরিচায়ক এবং ভুলের স্বীকারোক্তি তার বিনয় ও নতির নির্দেশক। আর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার এটাই পদক্ষেপ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর কতক লোক রয়েছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করে। তারা সৎকর্মের সাথে অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে। আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আত-তওবা, ৯/১০২)*।

মুসলিম ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য :

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে দুনিয়াতে তার পাপ স্বীকার করে নেওয়া এবং আখেরাতে তার স্বীকৃতি দেওয়া। বান্দা এটা করতে পারলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '(ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি স্বীকার করছ? অমুক পাপের কথা কি তুমি স্বীকার করছ? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে যখন তিনি তার কাছ হতে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন আর বান্দা মনে মনে ভাবতে থাকবে তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার নেকীর আমলনামা তাকে দেওয়া হবে'।[৩] অর্থাৎ যথাসময়ে পাপ স্বীকার নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যখন সেই সময় পার হয়ে যায়, তখন অপরাধীর উপর পাপের শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। শাস্তির পাওয়ার আগে যারা পাপের কথা স্বীকার করে না, সেই সকল জাহান্নামীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, '...অতঃপর তারা তাদের পাপ স্বীকার করবে। কিন্তু জাহান্নামীরা (আল্লাহর রহমত হতে) দূর হোক! *(আল-মুলক, ৬৭/১১)*।

পাপ মোচনে ইসলামে নির্দেশনা :

ইসলাম মুসলিমদেরকে অপরাধ স্বীকার করার আদেশ দিয়েছে। পাশাপাশি মহান আল্লাহ যে পাপ গোপন রেখে দিয়েছেন তা প্রকাশ করা থেকে সতর্ক করেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার সকল উম্মতকে ক্ষমা করা হবে, প্রকাশকারী ব্যতীত। প্রকাশ করার অর্থ হলো, রাতের বেলা কেউ অপরাধ করল; আর আল্লাহ তা গোপন রেখে দিয়েছেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই অপকর্ম করে ফেলেছি। রাতে আল্লাহ কিন্তু তার পাপ লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল'।[৪]

বান্দা যখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি পাপ করে ফেলেছি', আর আল্লাহ অগণিত নেয়ামতের বদলে সে ঘৃণ্য অবাধ্যতার কারণে তার মন-প্রাণ লজ্জায় হেট হয়ে যায়, তখন এই লজ্জাবোধ তার ঈমানকে আরও শক্তিশালী করে এবং আল্লাহর রহমতের হকদার করে দেয়। পাপের পরে তওবা আল্লাহর অতি বড় করুণা। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যারা তাক্বওয়াবান, তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রনা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়' *(আল-আ'রাফ, ৭/২০১)*।

তওবা অপরাধীর জন্য সম্মান বৃদ্ধির কারণ :

কতক পাপ পাপীকে অবনত অন্তর উপহার দেয়। কতক অপরাধ অপরাধীকে তওবা করার সুযোগ করে দেয়, যা তার মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, তার আখলাক-চরিত্রকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম করে দেয়। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, একজন বিশিষ্ট ছাহাবী মহাপাপ করে বসে। অতঃপর সে এমন তওবা করে, যার বিবরণ গিয়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সে এমন তওবা করেছে, যদি সকল উম্মতের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে তা যথেষ্ট হবে'।[৫] হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে, (বান্দা যখন বলে) 'হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি আমাকে ক্ষমা করো' আর আল্লাহ ব্যতীত ক্ষমাকারী কে আছে? তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দাকে জানিয়ে দাও নিশ্চয়ই আমি পরম ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু' *(আল-হিজর, ১৫/৪৯)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি পাপ করে অথবা নিজের প্রতি অবিচার করে; অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু হিসাবে পাবে' *(আন-নিসা, ৪/১১০)*। হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, (আল্লাহ বলেন) 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিন-রাত অপরাধ করে থাক, আর আমি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব'।[৬]

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪১।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬৯।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫; মিশকাত, হা/৩৫৬২।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৭; মিশকাত, হা/২৩২৬।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ক্ষমা প্রার্থনা করাটা নবী ও সৎ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য। তওবা সকল ওষুধের মহা ওষুধ। অন্তরকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে দেয়। তওবা হল সেই আলোর জ্যোতি, যা সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং অসুস্থ মনকে সুস্থ করে তোলে। পাপের ভারে ন্যুব্জ অন্তরকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই তওবার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার যথাযথ মর্যাদা দান করবেন' *(হূদ, ১১/৩)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তওবা করে থাকি'।

যে ব্যক্তি তার রবকে চিনে এবং তাঁর সামনে নিজেকে উপস্থিত করে; তার রবকে ভয় করে, তাঁর দিকে ছুটে আসে এবং তাঁর ভয়ে অশ্রু ঝরায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা কেন আল্লাহর কাছে তওবা করে না ও প্রার্থনা করে না? বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু' *(আল-মায়েদা, ৫/৭৪)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*। মহিমান্বিত কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে বরকত দান করুন এবং এর মূল্যবান উপদেশ ও আয়াতের মাধ্যমে উপকার দান করুন! এই কথা বলে আমি আল্লাহর কাছে আমার ও আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনারাও তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান। কেননা তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ছানী খুতবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক্ব দান করেছেন। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর আদেশ-নিষেধে তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আমাদের নেতা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা। তার, তার পরিবার ও ছাহাবীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!

আল্লাহর সহনশীলতার পরিচয় হলো তিনি অপরাধীকে তওবা করার অবকাশ দেন। যদি পুনরায় পাপে জড়িয়ে পড়ে অতঃপর তওবা করে, তাহলে আল্লাহও তার প্রতি অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ ক্ষমা করে বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না বান্দা বিরক্ত হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিপালক আর তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছ এবং আমরা তোমার নগণ্য বান্দা। আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা তোমার ওয়াদার উপর রয়েছি। আমরা আমাদের কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আপনার কাছে আমাদের গুনাহের কথা স্বীকার করছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। বস্তুত আপনি ব্যতীত পাপ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং যে সকল কথা ও কর্ম জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় তা চাচ্ছি। আমরা আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি এবং যে সকল কথা ও কর্ম জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয় তা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছি।

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং ক্ষমা করে দিন সেই সকল ভাইদের, যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আর মুমিনদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিয়েন না' *(আল-হাশর, ৫৯/১০)*। হে আমাদের রব! দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান!

'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন, যেমনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

www.al-itisam.com

ওযূর গুরুত্ব ও ফযীলত

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

আল্লাহ তাআলা তার ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ছালাত ইবাদতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যার জন্য পবিত্রতা অপরিহার্য। পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো ওযূ। এর অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তা তুলে ধরা হলো।

ওযূর গুরুত্ব ও ফযীলত :

(১) ওযূকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন : ওযূর মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থীগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে পসন্দ করেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*।

(২) ওযূ ঈমানের অর্ধেক : এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

আবু মালিক আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ওযূ ঈমানের অর্ধেক'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ 'সুষ্ঠুভাবে ওযূ করা ঈমানের অর্ধেক'।[২]

(৩) ওযূ ছালাতের চাবি : ওযূ ছাড়া ছালাত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ছালাতের চাবি হলো ওযূ আর ছালাতের 'তাহরীম' হলো 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার বলা) এবং তার 'তাহলীল' হলো (ছালাতের শেষে) সালাম ফিরানো'।[৩]

(৪) ওযূর মাধ্যমে ছোট পাপ ঝরে যায় : মুমিন বান্দা যখন ছালাতের জন্য ওযূ করে, তখন ওযূর সাথে তার ছোট পাপসমূহ বের হয়ে যায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমভাবে ওযূ করে, তার শরীর হতে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ হতেও তা বের হয়ে যায়'।[৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خرجت من يَدَيْهِ كل خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলিম অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং তার চেহারা ধুয়ে নেয়, তখন তার চেহারা হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার চোখের দ্বারা কৃত সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে চোখ দিয়ে দেখেছে। যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাত দিয়ে করা গুনাহ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়, যা তার দুই হাত দিয়ে ধরার কারণে সংঘটিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সে যখন তার দুই পা ধৌত করে, তখন তার পা দ্বারা কৃত গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় যে পাপের জন্য সে দুই পায়ে হেঁটেছে। ফলে সে (ওযূর জায়গা হতে উঠার সময়) সকল গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যায়'।[৫]

(৫) ওযূ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে : এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বিষয়ের বলব না, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং

---

* আলিম ২য় বর্ষ, চরবাটা ইসমাঈলিয়া আলিম মাদরাসা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

১. তিরমিযী, হা/৩৫১৭; ছহীহ জামে' ছাগীর, হা/৭১৫২।

২. ইবনে মাজাহ, হা/২৮০; নাসাঈ, হা/২৪৩৭; ছহীহ তারগীব, হা/১।

৩. আবুদাঊদ, হা/৬১৮; তিরমিযী, হা/৩; মিশকাত, হা/৩১২।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫; মিশকাত, হা/২৮৪।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৪; মিশকাত, হা/২৮৫।

মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন? ছাহাবীগণ আবেদন করলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, 'কষ্ট হলেও রাযিয়াল্লা-হু আনহু পূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ রাখা এবং এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর আর এক ওয়াক্ত ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা।[৬]

(৬) ওযূ জান্নাত লাভের মাধ্যম : ওযূর মাধ্যমে মুমিন বান্দা জান্নাত লাভ করে। রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং উত্তমভাবে ওযূ করবে, এরপর বলবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু। **অর্থ :** 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল'; তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে। এসব দরজার যেটা দিয়ে খুশি সে সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[৭]

(৭) ওযূর স্থান দেখে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল ﷺ তার উম্মতকে চিনবেন : ক্বিয়ামতের দিন রাসূল ﷺ সমস্ত মানুষের মধ্যে তার উম্মতকে চিনবেন। এ ব্যাপারে ছাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কীভাবে আপনি নূহ আলাইহিস সালাম থেকে আপনার উম্মত পর্যন্ত এতো লোকের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার উম্মত ওযূর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও ধবধবে হাত-পা বিশিষ্ট হবে, অন্য কোনো উম্মতের মধ্যে এরূপ হবে না'।[৮]

(৮) ওযূ করে নিদ্রা যাপনকারীর জন্য ফেরেশতারা দো'আ করে : হাদীছে এসেছে,

عن ابن عمر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ مَن باتَ طاهراً باتَ في شِعاره مَلَكٌ، فلا يستيقظُ إلا قال الملَكُ: اللّٰهُمَّ اغفِرْ لعبدِك فلانٍ فإنّه باتَ طاهراً.

ইবনে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাপন করবে, তার সাথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখন সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তখন ফেরেশতা বলে, আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করুন! কেননা সে পবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাপন করেছে'।[৯]

(৯) ওযূতে শয়তানের গিঁট খুলে যায় : ঘুম থেকে উঠে ওযূ করলে শয়তানের গিঁট খুলে যায়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের কোনো লোক যখন (রাতে) ঘুমিয়ে যায়, শয়তান তার মাথার পেছনের দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় শয়তান তার মনে এ কথার উদ্রেক করে দেয় যে, এখনো অনেক রাত বাকী, কাজেই ঘুমিয়ে থাকো। সে যদি রাতে জেগে উঠে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তাহলে তার (গাফলতির) একটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে যদি ওযূ করে (গাফলতির) আরও একটি গিরা খুলে যায়। যদি সে ছালাত আরম্ভ করে, তখন তার তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। বস্তুত এই লোক পাক-পবিত্র হয়ে ভোরের মুখ দেখে, নতুবা অপবিত্র হয়ে ভোরের দিকে কলুষ অন্তর ও অলস মন নিয়ে উঠে'।[১০]

(১০) ওযূ করে নিদ্রা যাপনকারীর দো'আ কবুল হয় : হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاه.

মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে মুসলিম রাত্রে পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে ঘুমিয়ে যায়, তারপর রাত্রে জেগে উঠে আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাকে (দুনিয়া ও আখেরাতে) অবশ্যই কল্যাণ দান করেন'।[১১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ওযূর ফযীলত অনেক। পরিপূর্ণভাবে ওযূ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে অশেষ কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সুন্দরভাবে ওযূ করে এই ফযীলতগুলো অর্জনের তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫১; মিশকাত, হা/২৮২।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৪; তিরমিযী, হা/৫৫; মিশকাত, হা/২৮৯।
৮. আহমাদ, হা/৩১২৩০; মিশকাত, হা/২৯৯।
৯. ছহীহ তারগীব, হা/৫৯৭।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/১১৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৬; মিশকাত, হা/১২১৯।
১১. আবুদাঊদ, হা/৫০৪২; মিশকাত, হা/১২১৫।

মূর্তি বনাম ভাস্কর্য ইস্যু : উত্তেজনা, বিতর্ক ও আন্দোলন

-জুয়েল রানা*

ভূমিকা : দেশে এখন মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে উত্তেজনা চলছে। ঢাকার ধোলাইরপাড় চত্বরে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ভাস্কর্য তৈরির পরিকল্পনার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই দেশ বরেণ্য শীর্ষ আলেমগণ সেই পরিকল্পনার বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছেন। একজন ব্যক্তিমানুষের অবিকল অবয়বে প্রস্তুতকৃত মূর্তি ব্যক্তিটির স্মৃতিকে ধারণ এবং শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশে প্রস্তুত করে দেশে-বিদেশের বিভিন্ন স্থান যেমন- সড়কদ্বীপ, ভবনের সামনের চত্বর, ভবনের অভ্যন্তর প্রভৃতিতে স্থাপন করা হয়। ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে নির্মিত মূর্তি দেবমূর্তি না হলেও কোনো বিশেষ দিন যেমন- ব্যক্তিটির জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস অথবা ব্যক্তিটির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশে ব্যক্তিমূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণপূর্বক কিছু সময় এর সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্যক্তিমূর্তির প্রতি এভাবে শ্রদ্ধা জানানো অন্যান্য ধর্মে নিষিদ্ধ না হলেও ইসলাম ধর্মে এটি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আবার অনেক সময় দেখা যায় এরূপ ব্যক্তির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ইসলাম যেকোনো প্রতিকৃতিতে এরূপ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো অনুমোদন দেয় না।

মূর্তি ও ভাস্কর্য পরিচিতি : মূর্তি ও ভাস্কর্য উভয়ই বিশেষ্য। মূর্তির সমার্থক হলো প্রতিমা, আকার, আকৃতি, দেহ, চেহারা প্রভৃতি। অপরদিকে ভাস্কর্যের সমার্থক হলো প্রতিমা বা কাষ্ঠ, প্রস্তর, মর্মর, তাম্র, মৃন্ময়, মণি প্রভৃতির মূর্তি। মূর্তির ইংরেজি statue, body, incarnation. embodiment, image, form, shape, figure, idol, appearance প্রভৃতি আর ভাস্কর্যের ইংরেজি sculpture.[১]

মূর্তি হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর খোদাইকৃত অথবা ছাঁচে ঢালা অবয়ব, যা ব্যক্তি বা প্রাণীর আকৃতিসম অথবা বৃহদাকৃতির। এটি সচরাচর ত্রিমাত্রিকরূপে উপস্থাপন করা হয়। সহজে বহনযোগ্য মূর্তিগুলোকে বলা হয় ক্ষুদ্রাকৃতির মূর্তি। পৃথিবী বিখ্যাত মূর্তিগুলোর অন্যতম হলো যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাচু অব লিবার্টি, ইতালির মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ডেভিড, ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোর ক্রিস্ট দ্য রিডিমির এবং মিসরের গ্রেট স্ফিনিক্স অব গিজা।

ভাস্কর্য মাটি, পাথর, ধাতু প্রভৃতিতে খোদাই বা লেপনের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক বা বিমূর্তভাবে উপস্থাপনকৃত শিল্পকর্ম। যেসব ভাস্কর্যে মানুষ অথবা প্রাণীর বহিঃপ্রকাশ থাকে, সেগুলোকে বলা হয় মূর্তি। অপরদিকে যেসব শিল্পকর্ম মূর্তিহীন বা ভাবনামূলক বা অনবয়ব, সেগুলো হলো ভাস্কর্য। সব মূর্তিকে ভাস্কর্যরূপে আখ্যায়িত করা গেলেও সব ভাস্কর্যকে মূর্তিরূপে আখ্যায়িত করা যায় না।

যেসব মূর্তিকে সামনে রেখে পূজা-অর্চনা করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় দেবমূর্তি। দেবমূর্তি বিভিন্ন দেব-দেবীর কল্পিত অবয়ব। পাথরে খোদাইকৃত বা ধাতব বস্তুর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত দেবমূর্তি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। মাটি লেপনের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত দেবমূর্তি বিশেষ ধরনের পূজা উপলক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয় এবং পূজা সমাপনান্তে তা পুকুর, নদী বা সমুদ্রের পানিতে বিসর্জন দেওয়া হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, মাটি দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেবমূর্তি বিভিন্ন উপাসনালয়ে বা গৃহে পরবর্তী পূজার আগমন অবধি সংরক্ষণ করা হয়।

আমাদের দেশে ভাস্কর্যের প্রতিনিধিত্বমূলক ও বিমূর্ত উভয় ধরনের উপস্থাপন রয়েছে। যেমন- মুজিবনগরে সাত বীরশ্রেষ্ঠের অবিকল অবয়বের প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থাপনের মাধ্যমে যে ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে, তা সমভাবে ভাস্কর্য ও মূর্তি। আবার স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ একটি স্মারক স্থাপনা ও ভাস্কর্য। এ ভাস্কর্যটিতে সাতটি ত্রিভুজাকৃতির মিনারের শিখর যথা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন, আটান্ন, বাষট্টি, ছেষট্টি, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিটি এক ভাবব্যঞ্জনায় প্রবাহের বহিঃপ্রকাশ দেখানো হয়েছে, যা ভাস্কর্যের বিমূর্ত উপস্থাপন। অনুরূপ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মধ্যস্থলের সুউচ্চ কাঠামো স্নেহময়ী মায়ের আনত মস্তক এবং এর দু'পাশের দু'টি করে

---

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. Bangla Academy English-Bengali Dictionary (33rd Reprint : Magh 1416/January 2010), P. 685.

ক্রমহ্রস্বতর কাঠামো সন্তানের প্রতীকস্বরূপ স্মারক স্থাপনা ও ভাস্কর্যের বিমূর্ত উপস্থাপন।

মূর্তি ও ভাস্কর্যের সূচনা ও বিকাশ : শুধু পূজার জন্য নয়; মৃত ব্যক্তির স্মারক হিসাবেও মূর্তি নির্মাণ আরব জাহেলী সংস্কৃতির একটা অংশ ছিল। মৃত ব্যক্তির কবরের উপর তারা স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করত। কোনো কোনোটাতে মৃত ব্যক্তির ছবিও অঙ্কন করা হতো। আবার কিছু কিছু স্মারক ভাস্কর্য আকারেও তৈরি করা হতো। সেসব স্তম্ভের গায়ে মৃতের নামধাম ইত্যাদি লিখিত থাকত।

আরবের অন্ধকার যুগের বিখ্যাত একটি মূর্তি হলো 'লাত'। এই মূর্তি ও তার মন্দির তায়েফ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়, যে স্থানে মূর্তি ও মন্দির স্থাপিত হয়, সেটা মূলত এক ব্যক্তির সমাধি। ধর্মীয়ভাবে তার গুরুত্ব ছিল। 'লাত' তারই উপাধী। মৃত্যুর পর তার সমাধির উপর ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় এবং ধীরে ধীরে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

মূর্তি সম্পর্কে জাহেলী কুসংস্কার এত ব্যাপক ও গভীর ছিল যে, তাদের চেতনা-বিশ্বাস এবং কর্ম ও উপাসনা সবকিছু একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। এই মূর্তিগুলোকে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হতো। আয়ু, সুস্থতা, বিপদাপদ থেকে মুক্তি, বৃষ্টি, ফল-ফসল ইত্যাদি তাদের কাছে প্রার্থনা করা হতো। এদের নামে মানত করা হতো এবং পশু বলি দেওয়া হতো।

এমনকি মূর্তির নামে মানব বলির রেওয়াযও ওই সংস্কৃতির অংশ ছিল। হিরা অঞ্চলের শাসকরা মূর্তির নামে মানুষ জবাই করত। ইতিহাসে এসেছে, আরবের বিখ্যাত মূর্তি 'ওয্যা'র নামে মুনযির ইবনে মাউস সামা চারশ' পাদ্রীকে জবাই করেছিল।[৩]

মূর্তি ও ভাস্কর্যের সঙ্গে মিথ্যার সম্পর্ক : মূর্তি বা ভাস্কর্যের সঙ্গে মিথ্যার সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর। বিগত হাজার বছরে এই সত্য অসংখ্যবার প্রমাণিত হয়েছে। মূর্তিপূজক সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআন মাজীদ যে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারণা দান করেছে, তাতে এই সত্যই প্রতিভাত হয়।

আরবের মূর্তিপূজারী সম্প্রদায় তাদের মূর্তিপূজার যৌক্তিক ভিত্তি অন্বেষণ করতে গিয়ে বলত, 'আমরা এদের উপাসনা শুধু এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে'। অর্থাৎ মূর্তির প্রতি ভক্তি নিবেদনের পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। তা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ। বলাবাহুল্য, এটা এক নির্জলা মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কুসংস্কার। কেননা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য অন্য কোনো কিছুর মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। এটা এক অসার যুক্তি, যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য নয়; বরং মূর্তিপূজার যৌক্তিক বৈধতা অন্বেষণের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

তদ্রূপ মূর্তিপূজার দিকে যারা অন্যদের আহ্বান করেছে দেখা যায়, তারাও মিথ্যারই আশ্রয় নিয়েছে। কুরআন মাজীদে মূসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি যখন 'তাওরাত' গ্রহণের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন সামেরী একটা স্বর্ণের গো-বৎস প্রস্তুত করল এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমকে আহ্বান করে বলল, 'এটাই হচ্ছে তোমাদের এবং মূসার উপাস্য, কিন্তু মূসা তাকে বিস্মৃত হয়ে অন্যত্র অন্বেষণ করে চলেছেন'।

ইসলামপূর্ব আরবের অন্ধকার যুগে বিভিন্ন মূর্তি ও সেগুলোর পূজা-অর্চনার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায় যে, এগুলোর প্রতিষ্ঠা ও প্রচলনের ক্ষেত্রে মিথ্যারই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মোটকথা, মূর্তিভিত্তিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে মিথ্যা ও প্রতারণা এবং বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারই হচ্ছে প্রধান নিয়ামক।

বর্তমানেও মুসলিম সমাজে ভাস্কর্য প্রীতির আবহ সৃষ্টির যে অপপ্রয়াস পরিচালিত হচ্ছে, তাতেও অপরিহার্যভাবেই মিথ্যাচার ও কপটতার চর্চাই প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যথা কে না জানে যে, শিল্পচর্চার পক্ষে মূর্তি ও ভাস্কর্য কোনো অপরিহার্য উপাদান নয়? অথচ এ কথাটাই খুব জোরে-সোরে প্রচার করা হচ্ছে এবং এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, মূর্তির প্রতি নমনীয় হওয়া ছাড়া শিল্পচর্চাই সম্ভব নয় এবং মূর্তি ও শিল্প এ দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত! বলা বাহুল্য, এটা এক জঘন্য মিথ্যাচার। আর এ মিথ্যাচারও কপটতাপূর্ণ। শিল্পের প্রতি প্রেম নয়; বরং একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই এর উৎপত্তি।

কুরআন মাজীদের উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহবিমুখ সম্প্রদায়ের মূর্তিপ্রেমের অন্যতম প্রধান কারণটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধতা সৃষ্টি এবং তা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে মূর্তি হলো অন্যতম প্রধান উপকরণ। অতএব, এক্ষেত্রে বাহ্যত শিল্প রক্ষা, প্রগতিশীলতা রক্ষা ইত্যাদি যতকিছুই বলা হোক, প্রকৃত বিষয়টা ইসলামী আদর্শের প্রতি অনীহা ও ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা থেকেই উৎসারিত।

২. আদ্দুররুল মানছূর, ৬/১২৬।
৩. আল-মুফাসসাল, ৬/২২৮, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৭।

এজন্য ইসলামী আদর্শের প্রতি যারা আস্থাশীল, এই বিষয়ে তাদের কোনো বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়।

আলোচিত প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যেসব প্রচার-প্রচারণা হয়েছে, তাতে দু'ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে : (১) শিল্পকলার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ। (২) ভাস্কর্য নির্মাণ ইসলাম বিরোধী নয় বলে ধারণা দানের অপচেষ্টা। এই দু'টো প্রয়াসের সততা পরীক্ষা করা কঠিন কিছু নয়। শিল্পকলার প্রতি সহানুভূতিই যদি সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার মূল কারণ হয়ে থাকে, তবে সরকার ওই স্থানে এমন কিছু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা হবে এ দেশের সাধারণ জনগণের ঈমান, আক্বীদা এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আর একই সঙ্গে নির্মাণশিল্পেরও সুন্দর দৃষ্টান্ত। এরপরও যদি তারা বিরোধিতা করেন, তবে বুঝতে হবে, শিল্পকলার কথাটা বাহ্যিক আচরণ মাত্র এবং এই দেশকে মুসলিমের দেশ হিসেবে পরিচয় দিতেই তারা অনাগ্রহী।

ভাস্কর্য ও মূর্তিপূজার নেপথ্যে : আইয়ামে জাহেলিয়াতের পতন ঘটিয়ে যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেহেতু ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রধান শত্রু জাহেলিয়াত বা অজ্ঞানতা তথা একত্ববাদী ধর্মমতের প্রতিকূলে মূর্তিপূজা। এই কারণে গত চৌদ্দশ বছর ধরে তামাম দুনিয়ার মুসলিমরা একসাথে সিংহের মতো গর্জন করে ওঠেন যখন তারা দেখেন, ইসলাম এবং মুসলমানিত্বের বেশ ধরে সুকৌশলে মহল বিশেষ মূর্তিপূজাকে পুঁজি করে সেই আবু জাহলের বংশধরদের মতো অপচেষ্টা চালায়।

জাহেলী যুগের মূর্তিপূজা নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের মতে, কেবল স্বার্থসিদ্ধি এবং ধান্দাবাজির জন্য গোত্রগুলো মনগড়া মূর্তি উদ্ভাবন করত। মূর্তিকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক গল্প ফাঁদা হতো এবং ভেলকিবাজি করে কিছু চালাক লোক যারা গোত্রপতিদের খয়ের খাঁ ছিল, তারা সাধারণ মানুষকে বেকুব বানাত। মূর্তির মাথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে আগুন বের হওয়া অথবা গভীর রাতে মূর্তির নড়াচড়া বা উড়ে বেড়ানোর মতো জাদুর কৌশল জানা লোকজনকে ভাড়া করে এনে গোত্রপতিরা সাধারণ মানুষকে প্রথমে মূর্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলত এবং বলত, মূর্তিকে ইলাহ মেনে পূজা না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। অশিক্ষিত বেদুঈনরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই গোত্রপতিদের ফাঁদে ধরা পড়ত এবং নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পত্তির বিরাট অংশ মূর্তিপূজায় ব্যয় করত, যা অলক্ষ্যে গোত্রপতিদের পকেটেই চলে যেত।

মহাকালের মূর্তিসংক্রান্ত ধান্ধাবাজি স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেশ, কাল, সমাজকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার নির্যাসের একটি বিরাট অংশ শুষে নেয়। রাজনীতি-অর্থনীতি, প্রেম-ভালোবাসা, যৌনতা থেকে শুরু করে যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনকি আনন্দ-উল্লাসেও ধান্দাবাজরা মূর্তিপূজাকে ঢুকিয়ে দেয়।

সারা দুনিয়ায় সেই অতীতকাল থেকে আজ অবধি মূর্তি নিয়ে যত আদিখ্যেতা এবং অনাসৃষ্টি হয়েছে, তা অন্য কিছু নিয়ে হয়নি। মূর্তির জন্য যত যুদ্ধ হয়েছে অথবা মূর্তির জন্য যত মানুষ মরেছে তা কোনো সাধারণ যুদ্ধ কিংবা কোনো ভয়ংকর মহামারী-রোগবালাই অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয়নি। মূর্তিকে কেন্দ্র করে যত অপরাজনীতি, যত অপসংস্কৃতি এবং যতরকম অবৈধ লেনদেন হয়েছে, তা অন্য কোনো পাপাচারের সাথে তুলনীয় নয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাম্প্রতিককালে মহানবী ﷺ-এর একটি ব্যঙ্গচিত্রকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাসে ফ্রান্সের যে ক্ষতি হয়েছে, তা 'ওয়াটার লু'র যুদ্ধের ক্ষতির চেয়েও বেশি বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

এ কারণে সর্বকালের সেরা ধর্ম ইসলাম যেকোনো মূর্তির বিষয়েই অত্যন্ত কঠোর। এই ধর্মের অনুসারীরা যখন দেখেন যে, কোথাও আশরাফুল মাখলূকাতরূপী জীবন্ত মানুষের পরিবর্তে মাটি-পাথর বা কোনো ধাতুর তৈরি পুতলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, পুতলির কাছে মাথা নত করা হয়, পুতলির গলায় মালা পরিয়ে সেই দানব জড় পদার্থের চতুর্দিকে কিছু ধড়িবাজ মানুষ ধান্ধা হাসিলের উদ্দেশ্যে নাচন-কুর্দন করে এবং জাহেলি যুগের মতো বিশ্বজাহানের মালিকের ঐশী নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় তখন তারা আপন ধর্মের লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য বলে ওঠে, হুঁশিয়ার! সাবধান! শিরক করো না।[৪]

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য কিংবা মূর্তি নিয়ে যে এক শ্রেণির চাটুকাররা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় স্বার্থ হাসিল করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে কেন্দ্র করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার খবর সংবাদ মাধ্যমে চাউর হয়েছে। অনেকে মূর্তিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ বলে দাবি করতে

৪. উপসম্পাদকীয় : জাহেলি যুগের মূর্তি পূজার নেপথ্যে, (সাবেক সংসদ সদস্য) গোলাম মাওলা রনি, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৭ নভেম্বর ২০২০।

চায় এবং তার বিরোধিতাকারীদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ট্যাগ দিতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে প্রথম মূর্তি নির্মাণ হয় ১৯৭৩ সালে গাজীপুরে। মানে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই বছর পর। যেই মূর্তি নির্মাণ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই বছর পর, সেটা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ হয়, তা আমার মাথায় আসে না।

বঙ্গবন্ধু যখন দেবতা : কেউ কেউ দাবি করছে, মূর্তি আর ভাস্কর্য নাকি এক জিনিস না। তাদের দাবি, মূর্তিকে দেব/দেবী মেনে পূজা-অর্চনা করা হয়। পক্ষান্তরে ভাস্কর্যকে পূজা-অর্চনা করা হয় না। তাদের দাবি যদি মেনেও নিই, তারপরও কি তারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে যে, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে পূজা করা হবে না? কখনোই না। কারণ, বঙ্গবন্ধুকে অনেকেই দেবতা মনে করে পূজা-অর্চনা ও ভক্তি করে থাকে। যেমন : বরিশালের বানারীপাড়ার কাজলাহার গ্রামের বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৭৯ বছর বয়সী সুখরঞ্জন ঘরামী পেশায় আইনজীবী সহকারী। তিনি বঙ্গবন্ধুকে সাধারণ মানুষ মনে করেন না। বঙ্গবন্ধুকে তিনি মুক্তির দেবতা মনে করেন।

তার বিশ্বাস, দ্বাপর যুগে পাশবিক শক্তি যখন সত্য, সুন্দর ও পবিত্রতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন সেই অসুন্দর, অসুর ও দানবীয় পাশবিক শক্তিকে দমন করে মানবজাতিকে রক্ষা এবং শুভশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। একইভাবে পাকিস্তানী হানাদারদের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষা করতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন বঙ্গবন্ধু। তিনিই ছিলেন বাঙালি জাতির উদ্ধার কর্তা। তাই বঙ্গবন্ধুকে তিনি দেবতার আসনে বসিয়েছেন। প্রতিদিন ভগবান শ্রী কৃষ্ণের আরাধনা ও পূজা করেন। এরপর পূজা দেন বঙ্গবন্ধুর ছবিতে। দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে সুখরঞ্জন ঘরামী বঙ্গবন্ধুর ছবিতে পূজা দিচ্ছেন। সুখরঞ্জন ঘরামী বলেন, বঙ্গবন্ধু আমার কাছে মুক্তির দেবতা।[৫] ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো তিনিও শুভশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুধু কি তাই? ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কীভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পূজা করে, তা বিশ্বাস না হলে প্রদত্ত লিংকটিতে ভিজিট করে নিজ চোখে দেখে আসতে পারেন।[৬]

মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে পার্থক্য করা চরম ভুল : কেউ কেউ মূর্তি ও ভাস্কর্যের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য দেখাতে চান। এটা চরম ভুল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূর্তি ও ভাস্কর্য দুটোই পরিত্যাজ্য। কোনো প্রাণীর মূর্তি নির্মাণ করা ইসলামী শরীআতে কবীরা গুনাহ ও হারাম। মূর্তি সংগ্রহ, মূর্তি সংরক্ষণ এবং মূর্তির বেচাকেনা ইত্যাদি সকল বিষয় কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। মূর্তিপূজার কথা তো বলাই বাহুল্য, মূর্তি নির্মাণেরও কিছু কিছু পর্যায় এমন রয়েছে, যা কুফরী।

কুরআন মাজীদ ও হাদীছে এ প্রসঙ্গে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মূর্তি ও ভাস্কর্য দুটোকেই নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের স্পষ্ট নির্দেশ, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ 'তোমরা পরিহার করো অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ মূর্তিসমূহ এবং পরিহার করো মিথ্যাকথন' *(আল-হজ্জ, ২২/৩০)*। এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে সব ধরনের মূর্তি পরিত্যাগ করার এবং মূর্তিকেন্দ্রিক সকল কর্মকাণ্ড বর্জন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উপরের আয়াতে সকল ধরনের মূর্তিকে 'রিজস' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রিজস' অর্থ নোংরা ও অপবিত্র বস্তু। বোঝা যাচ্ছে যে, মূর্তির সংশ্রব পরিহার করা পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত রুচিবোধের পরিচায়ক। অন্য আয়াতে কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا 'আর তারা বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে এবং কখনো পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসরকে' *(নূহ, ৭১/২৩)*।

এখানে কাফের সম্প্রদায়ের দুটো বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে : (১) মিথ্যা উপাস্যদের পরিত্যাগ না করা। (২) মূর্তি ও ভাস্কর্য পরিহার না করা। তাহলে মিথ্যা উপাস্যের উপাসনার মতো ভাস্কর্যপ্রীতিও কুরআন মাজীদে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত। অতএব, এটা যে ইসলামে গর্হিত ও পরিত্যাজ্য তা তো বলাই বাহুল্য।

উপরের আয়াতে উল্লেখিত মূর্তিগুলো সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালাম -এর সম্প্রদায়ের কিছু পুণ্যবান লোকের নাম। তারা যখন মৃত্যুবরণ করেছে, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে এই কুমন্ত্রণা দিয়েছে যে, তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে মূর্তি স্থাপন করা হোক এবং তাদের নামে সেগুলোকে নামকরণ করা হোক।

৫. https://www.jagonews24.com/amp/623811.
৬.https://tbsnews.net/bangladesh/mujib-year/modi-pays-tribute-bangabandhu-birth-anniversary-57619.

www.al-itisam.com

লোকেরা এমনই করল। ওই প্রজন্ম যদিও এসব মূর্তির পূজা করেনি, কিন্তু ধীরে ধীরে প্রকৃত বিষয় অস্পষ্ট হয়ে গেল এবং পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূজায় লিপ্ত হলো।[৭]

কুরআন মাজীদে মূর্তি ও ভাস্কর্যকে পথভ্রষ্টতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ 'হে রব! এরা (মূর্তি ও ভাস্কর্য) অসংখ্য মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৬)*। অন্য আয়াতে এসেছে, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا - وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا 'আর তারা বলেছিল, তোমরা পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদের এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুওয়াকে, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসরকে। অথচ এগুলো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে' *(নূহ, ৭১/২৩-২৪)*। কুরআন মাজীদে একটি বস্তুকে ভ্রষ্টতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে, এরপর ইসলামী শরীআতে তা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য থাকবে- এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কী হতে পারে।

কুরআনের ভাষায় মূর্তি ও ভাস্কর্য হলো বহুবিধ মিথ্যার উৎস। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا 'তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তিপূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো' *(আনকাবূত, ২৯/১৭)*।

মূর্তি ও ভাস্কর্য যেহেতু অসংখ্য মিথ্যার উদ্ভব ও বিকাশের উৎস, তাই উপরের আয়াতে একে 'মিথ্যা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, মূর্তি ও ভাস্কর্য দুটোই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। হাদীছেও নবী করীম ﷺ মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে পরিষ্কার বিধান দান করেছেন।

(১) নবী করীম ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলার এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার ও তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরীক না করার বিধান দিয়ে'।[৮]

(২) আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, আলী ইবনে আবূ তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে কাজের জন্য নবী ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা এই যে, তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধি-সৌধ ভূমিসাৎ করে দিবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ...আর সকল চিত্র মুছে ফেলবে'।[৯]

(৩) আলী ইবনে আবূ তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম ﷺ একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো প্রাণীর মূর্তি পাবে তা ভেঙে ফেলবে, যেখানেই কোনো সমাধি-সৌধ পাবে, তা ভূমিসাৎ করে দিবে এবং যেখানেই কোনো চিত্র পাবে, তা মুছে দিবে?' আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হলেন। এরপর নবী ﷺ বলেছেন, 'যে কেউ পুনরায় উপরিউক্ত কোনো কিছু তৈরি করতে প্রবৃত্ত হবে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি নাযিলকৃত দ্বীনকে অস্বীকারকারী'।[১০]

এই হাদীছগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে, যে কোনো প্রাণীর মূর্তিই ইসলামে পরিত্যাজ্য এবং তা বিলুপ্ত করাই হল ইসলামের বিধান। আর এগুলো নির্মাণ করা ইসলামকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ 'প্রতিকৃতি তৈরিকারী (ভাস্কর, চিত্রকর) শ্রেণি হলো ওই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে'।[১১]

(৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ 'ওই লোকের চেয়ে বড় যালেম আর কে যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে। তাদের যদি সামর্থ্য থাকে, তবে তারা সৃজন করুক একটি কণা এবং একটি শষ্য কিংবা একটি যব'।[১২]

এই হাদীছটি বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যখন ভাস্কর-চিত্রকর, এমনকি গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদেরকে পর্যন্ত 'স্রষ্টা' বলতে এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে 'সৃষ্টি' বলতে সামান্যতমও দ্বিধাবোধ করা হয় না। কোনো কোনো আলোচকের আলোচনা থেকে এতটা ঔদ্ধত্যও প্রকাশিত হয় যে, যেন তারা সত্যি সত্যিই স্রষ্টার আসনে আসীন হয়ে গিয়েছেন!

ছহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ লেখেন, এই ভাস্কর ও চিত্রকর সর্বাবস্থাতেই হারাম কাজের মধ্যে লিপ্ত। আর যে এমন কিছু নির্মাণ করে যার পূজা করা হয়, তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আর যে স্রষ্টার সামঞ্জস্য গ্রহণের মানসিকতা পোষণ করে, সে কাফের'।[১৩]

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯২০।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩২।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯।
১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৫৭।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫৩।
১৩. ফাতহুল বারী, ১০/৩৯৭।

(৬) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِيْ؟ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً 'এই প্রতিকৃতি নির্মাতাদের (ভাস্কর, চিত্রকরদের) ক্বিয়ামত দিবসে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, যা তোমরা 'সৃষ্টি' করেছিলে তাতে প্রাণসঞ্চার করো!'[১৪]

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'যে কেউ দুনিয়াতে কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করে, ক্বিয়ামত দিবসে তাকে আদেশ করা হবে, সে যেন তাতে প্রাণসঞ্চার করে অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না'।[১৫]

(৮) আউন ইবনে আবু জুহায়ফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদ ভক্ষণকারী ও সূদ প্রদানকারী, উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীদের (ভাস্কর, চিত্রকরদের) উপর লা'নত করেছেন।[১৬]

এই হাদীছগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভাস্কর্য নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন কবীরা গুনাহ। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা কুফরীরও পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মূর্তি ও ভাস্কর্যের বেচাকেনাও হাদীছে সম্পূর্ণ হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(৯) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় থাকা অবস্থায় এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ ও মূর্তি এবং শূকর ও মৃত প্রাণী বিক্রি করা হারাম করেছেন'।[১৭]

(১০) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসুস্থতার সময় তার জনৈক স্ত্রী একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ইতোপূর্বে হাবাশায় গিয়েছিলেন। তারা গির্জাটির কারুকাজ ও তাতে বিদ্যমান প্রতিকৃতিসমূহের কথা আলোচনা করলেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন, ওই জাতির কোনো পুণ্যবান লোক যখন মারা যেত, তখন তারা তার কবরের উপর ইবাদতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি'।[১৮]

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, '(মক্কা বিজয়ের সময়) নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বায়তুল্লায় বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখলেন, তখন তা মুছে ফেলার আদেশ দিলেন। প্রতিকৃতিগুলো মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করেননি'।[১৯]

দৃষ্টান্তস্বরূপ ১১টি হাদীছ পেশ করা হলো। আলোচিত প্রসঙ্গে ইসলামী বিধান বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কুরআন মাজীদে যে কোনো ধরনের মূর্তির সংশ্রব ও সংশ্লিষ্টতা পরিহারের যে আদেশ মুমিনদেরকে করা হয়েছে, সে সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণাও উপরোক্ত হাদীছগুলো থেকে জানা গেল।

কুরআন ও সুন্নাহর এই সুস্পষ্ট বিধানের কারণে মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল বিষয়ের অবৈধতার উপর গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বার্থান্বেষী মহলের বিভ্রান্তি ও অপচেষ্টা : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (হাফিযাহুল্লাহ)-এর ভাস্কর্যবিরোধী কড়া বক্তব্যে একটি মহল বেশ বেজার! কিন্তু তাদেরকে একটি বিচ্ছিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। তারা একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টাও করছে। সেটি হলো, ভাস্কর্য তথা মূর্তির বিরোধিতাকে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা হিসাবে চিত্রিত করা। এরা চাচ্ছে সরকারকে ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে। এরা এই সংঘাতকে সারা দেশেও ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। আমি একটি কথা খুব পরিষ্কার ভাষায় বলছি যে, হাদীছের আলোকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুর মূর্তি/ভস্কর্য তৈরির কারণে তার কবরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব হতে পারে। লক্ষ করছি, যারা প্রকৃত অর্থে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসেন, তাদের মনে কথাটি দাগ কাটছে। তাদের মন ব্যথাতুর হচ্ছে। তারা সত্য বুঝতে পারছে। এটা মূর্তিপ্রেমীদের কাছে মোটেই ভালো লাগার কথা না। আমরা কখনোই হঠকারিতার পথে পা বাড়াবো না ইনশাআল্লাহ! তবে সরকার যদি ভাস্কর্য নামে মূর্তিসংস্কৃতি এভাবেই ছড়িয়ে দিতে থাকে, ক্ষমতার জোরে যদি ইসলামী ঐতিহ্যকে এভাবেই ধ্বংস করতে থাকে, তাহলে বহু কাঠখড়ি পুড়িয়ে ইসলামী মহলের সাথে যতটুকু দূরত্ব কমিয়েছে, ভাস্কর্য ইস্যুতে সরকারের মনোভাব অনড় থাকলে সেই দূরত্ব আরও বাড়বে।

আমাদের সচেতনতা ও করণীয় : মূর্তিকেন্দ্রিক শিল্প আর নাচ-গানকেন্দ্রিক সংস্কৃতি আর যাই হোক মুসলিমের শিল্প-সংস্কৃতি

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৫৭, ৭৫৫৮।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬৩।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/২২৩৬।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২৮; নাসাঈ, হা/৭০৪।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৫২।

হতে পারে না। শিল্প ও সংস্কৃতির মতো এত ব্যাপক বিষয়কে কেন একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী এত সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করে দেন, তা খুব সচেতনভাবে ভেবে দেখা দরকার। যে ভূখণ্ডের মানুষ এক লা-শরীক আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল, তাদের শিল্প-সংস্কৃতির উপর এই আরোপিত সংজ্ঞা শুধু কলমের জোরে চাপিয়ে দেওয়া হলে তা হবে খুবই দুঃখজনক। তথাপি এই বিষয়কে ইস্যু বানিয়ে বিধর্মী ও নাস্তিক্যবাদী শক্তি একজোট হয়ে গিয়েছে। কিছু দৈনিক পত্রিকা দেশ ও জাতির অন্য সব সমস্যা শিকেয় তুলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এই বিষয়ে বরাদ্দ করে চলেছে।

বিষয়টা আমরা সবাই জানি যে, শরীআতে যে বিষয়গুলো হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পরিহার করা ফরয এবং ওই হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করা হলো আরও গুরুত্বপূর্ণ ফরয। হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু ইসলামের গণ্ডি থেকে সে খারিজ হয়ে যায় না। কিন্তু হারামকে হালাল মনে করলে, কিংবা শরীআতের কোনো বিধানের প্রতি কটাক্ষ করলে সে কাফের হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে শরীআতের বিধি-বিধানের প্রতি এই কুফরী মনোভাব সৃষ্টি করার অপচেষ্টা অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। তাই মুমিনের প্রথম কর্তব্য হলো, নিজের ঈমান রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, এসব অপপ্রয়াসের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করা।

ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যের মধ্যে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ করণীয় বিষয়ে আদেশ এবং বর্জনীয় বিষয়ে নিষেধ করা ফরয করা হয়েছে। আর অন্তর থেকে হারামকে হারাম মনে করাকে বলা হয়েছে ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়।

আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শরীআত বিরোধী অপতৎপরতা প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়া, অন্তত মৌখিকভাবে বা লেখনীর মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানানো। যদি এদেশের এক-দশমাংশ ঈমানদারও ইসলাম বিরোধী কাজকর্মের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ হন, তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, ইসলাম বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা পোষণকারী লোকগুলো সংখ্যায় কত নগণ্য। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং দেশের নীতিনির্ধারণী স্থানগুলোতেও অনেক ঈমানদার মানুষ রয়েছেন। তাদের কর্তব্য সচেতনভাবে এই ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতাগুলো প্রতিরোধ করা। হতে পারে এ প্রসঙ্গে কোনো একটি পদক্ষেপ নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর দেশের শিক্ষিত ও উদ্যোগী শ্রেণির পক্ষে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া কঠিন কিছু নয়; প্রয়োজন শুধু সচেতনতা, আন্তরিকতা এবং উদ্যোগ।

উপসংহার : আমাদের দেশের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলিম বিধায় তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন যেকোনো কিছু পরিহার দেশ ও জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য অত্যাবশ্যক।

কুরআন ও ছহীহ্ সুন্নাহ্ ভিত্তিক ও বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে পরিচালিত একটি উন্নতমানের কওমী মাদ্‌রাসা

দারুস্ সুন্নাহ্ ক্যাডেট মহিলা মাদ্‌রাসা
উত্তর কেল্লাবন্দ (বানিয়াপাড়া), সিও বাজার, সদর, রংপুর।

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

ভর্তি চলছে

হিফয্ শাখা :
* মক্তব/নূরানী * নাযেরা * হিফয্ * শুনানী

কিতাব শাখা :
১ম জামায়াত থেকে ৮ম জামায়াত পর্যন্ত।

যোগাযোগ
মশিউর বিন মাহতাব
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১২-৫৯৩৬৮৩

মাদ্‌রাসার বৈশিষ্ট্যাবলী :
- কুরআন মাজিদ ও ছহীহ্ সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ।
- মেধাবী ও উচ্চ ডিগ্রীধারী হাফেযা ও সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান।
- আরবী, ইংরেজি ও অংক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বদানসহ বক্তব্য প্রদানের প্রশিক্ষণ।
- আবাসিক/অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক সিসি টিভি দ্বারা নিরাপত্তা মনিটরিং।
- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে ও সালফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী পাঠদান।
- অত্যন্ত মনোরম ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ।
- আবাসিক ছাত্রীদের ফজর ও আছর ছলাতের পর নাস্তাসহ ৫ বেলা স্বাস্থ্য ও মানসম্মত খাবার পরিবেশন।
- পৃথক পৃথক থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা।
- সার্বক্ষণিক জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- হাদীস ফাউন্ডেশনের সিলেবাস অনুযায়ী পরিচালিত।
- প্রবাসী অভিভাবকগণের সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ।
- হিফয্ শেষে বয়স ও মেধা অনুযায়ী ৪র্থ/৫ম শ্রেণিতে ভর্তি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।
- মাসআলা মাসায়েল, দোয়া ও হাদীস মুখস্তকরণ।
- মাদ্‌রাসায় থাকা অবস্থায় কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে তার প্রাথমিক চিকিৎসার তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ ফ্রি ব্যবস্থাপনায় "স্বতন্ত্র" ইয়াতীম বিভাগ।

ধূমপান কি হারাম?

-জাবির হোসেন*

বাম হাতে চায়ের কাপ ধরে, ডান হাতে থাকা লম্বা সিগারেটের ধোঁয়া টেনে নাক ও মুখ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে সুরজ বলল, ‘এখন ভারতের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, বুঝলি’।

আমরা আজকে এসেছি আমাদের মেস থেকে কিছুটা দূরে, বাপীদার চায়ের দোকানে। এখানে খুব ভালো চা পাওয়া যায় বলে আমরা মাঝেমধ্যেই আসি। আমার সঙ্গে আছে আহমাদ, সুরজ, কাফিল ও সাহিল।

চায়ের দোকানকে অনেকেই বলে থাকে ‘মিনি নবান্ন’[১]। কেউ কেউ বলে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পি.এন.পি.সি’[২]-এর জায়গা। প্রত্যেকটি নামকরণের পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে, পাঠকদের মধ্যে যারা নিয়মিত বা অনিয়মিত চায়ের দোকানে পদচারণা করেন, নিঃসন্দেহে আপনারা সকলেই অবগত আছেন।

সুরজের কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে মুখ খুলল আহমাদ। হাতে থাকা দৈনিক সংবাদপত্রটি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুরজের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দেশের কথা ভাবার আগে নিজের কথা ভেবে দেখ। হারাম জিনিস মুখে দিয়ে নিজের ও দশের বারোটা বাজিয়ে দেশের পরিস্থিতির জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছিস’।

‘হারাম’ কথাটি পছন্দ হলো না কাফিলের। তৎক্ষণাৎ আহমাদকে বলল, ‘ধূমপান করা কি হারাম?’

‘হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। এতে কোনো ডাউট নেই’। আহমাদ বলল।

‘তবে আমাদের গ্রামের মওলানারা কেন বলে যে, ধূমপান করা মাকরূহ? আর কিছু মওলানাকে তো আমি নিজেই দেখেছি ধূমপান করতে’। কাফিল প্রত্যুত্তরে জানাল।

সুরজ কাফিলের কথাকে সমর্থন জানিয়ে বলল, ‘আমাদের গ্রামেও তো’।

‘তাহলে তো এই বিষয়ের উপর কিছু কথা বলতে হয়। যদি তোদের শোনার মানসিকতা থাকে, তাহলে আলোচনা করতে পারি’। আহমাদ বলল।

আমি তো রাজি। মাথা নাড়িয়ে জানালাম। সুরজ ও কাফিল উভয়েই ‘হ্যাঁ’ সূচক ইঙ্গিত দিল। শুধুমাত্র সাহিল, কিছু না বলে আহমাদের রেখে দেওয়া সংবাদপত্রটি হাতে নিয়ে মনোযোগ দিল। আমাদের আলোচনায় তেমন আগ্রহ দেখালো না।

আমি আহমাদকে আমার একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, ‘গত বছর কলকাতায় আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম, ধূমপান হারাম। তাতে সে একটি চটি বই বের করে দেখালো যে, ধূমপান মাকরূহ। আমিও আর তর্কে এগোইনি’।

আহমাদ বলল, ‘বিষয়টি তর্কের নয়। বিষয়টি হচ্ছে সঠিক উপলব্ধির। সাধারণ মানুষের বেশিরভাগই ফিক্বহের এই পরিভাষাগুলোর সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। জানিস, ধূমপানকে মাকরূহ বলার পেছনে একটি কারণ আছে। তবে সেই কারণ দেখিয়ে মাকরূহ বলার যুক্তি এখন আর নেই। তাই, ধূমপানকে বর্তমান আলেমরা হারাম বলে ফতওয়া দিয়েছেন’।

‘কী সেই কারণ?’ সুরজ বলল।

‘ধূমপান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাঁর সমাজে বিদ্যমান ছিল না। প্রায় হাজার বছর পরে তা বিভিন্ন মানব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তামাক ও ধূমপান প্রচলিত হওয়ার পরে কোনো কোনো ফক্বীহ মত প্রকাশ করেন যে, তা ‘মুবাহ’ বা বৈধ। কারণ তা অবৈধ করার মতো কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অধিকাংশ ফক্বীহ মত প্রকাশ করেন যে, ধূমপান মাকরূহ অর্থাৎ শরীআতের দৃষ্টিতে অন্যায় ও অপছন্দনীয় কর্ম। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, দেহে বা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে এমন খাদ্য ভক্ষণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। বিশেষত এইরূপ খাদ্য ভক্ষণ করে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করে তিনি বলেন, ‘যদি কেউ রসুন খায়, তবে সে যেন তার দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে না আসে বা আমাদের সাথে ছালাত আদায় না করে এবং রসুনের দুর্গন্ধ দিয়ে আমাদেরকে কষ্ট না দেয়। কারণ মানুষ যা থেকে কষ্ট পায়, ফেরেশতাগণও তা থেকে কষ্ট পান’।[৩]

এ হাদীছ ও এ অর্থের আরও অনেক হাদীছের আলোকে ফক্বীহগণ বলেছেন যে, পিয়াজ, রসুন বা কোনো দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে মুখে বা দেহে তার দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে গমন করা মাকরূহ। আর ধূমপানের মাধ্যমে মুখে যে দুর্গন্ধ হয়,

---

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. ‘নবান্ন’ হলো পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া শহরের একটি সরকারি ভবন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অফিস এখানে।

২. ‘পি.এন.পি.সি’ হলো পরনিন্দা-পরচর্চার সংক্ষিপ্ত রূপ।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৮৫৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৮-১১৩৯।

www.al-itisam.com

তা পিয়াজ বা রসুনের দুর্গন্ধের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টদায়ক। বিশেষত অধূমপায়ীদের জন্য এবং স্বভাবতই ফেরেশতাগণের জন্য। আর পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি খেয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে মসজিদে যাওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু ধূমপানের দুর্গন্ধের ক্ষেত্রে তা মোটেও সম্ভব নয়। এজন্য অধিকাংশ ফক্বীহ একমত হন যে, ধূমপান সর্বাবস্থায় মাকরূহ।

পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, ধূমপান মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য আধুনিক যুগের অধিকাংশ আলেম ধূমপান হারাম বলেছেন।[৪]

কাফিল বলল, 'এক মিনিট! প্রথমে বললি যে, ধূমপান নবী ﷺ-এর যুগে ছিল না। তবে আমার প্রশ্ন হলো, যে জিনিস নবীজীর যুগে ছিল না, তা কীভাবে হারাম হয়?'

আহমাদ বলল, 'পানাহার ও জাগতিক বিষয়ে একটি মূলনীতি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান না থাকার কারণে যে সকল খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সে বিষয়ে তাঁর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে ইজতিহাদ করতে হবে।[৫]

'দেখ, কোনো বস্তু হারাম হওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর জীবিত থাকা বা না থাকা শর্ত নয়। এ সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত মূলনীতিই প্রযোজ্য। যেমন : নবী করীম ﷺ-এর যুগে অনেক বস্তুই ছিল না, যেগুলো বর্তমানে আমরা ব্যবহার করছি'।

কাফিল বলল, 'তারপরও আমার মনে হয়, ধূমপান হারাম হলে কুরআন ও হাদীছে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকত? যেমন : রক্ত, শূকর, মৃত জীব, মদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে'।

'তুই যে ভাত-মুড়ি খাস, এগুলো হালাল না হারাম?' আহমাদ বলল।

'হালাল'।

'কিন্তু, এগুলো যে হালাল এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের কোথায় স্পষ্টভাবে বলা আছে? আবার বল তো, হিরোইন, গাঁজা এগুলো হালাল, হারাম না মাকরূহ?'

'হারাম'।

'কিন্তু, এগুলোও যে হারাম তা স্পষ্টভাবে কোথায় বলা আছে?'

কাফিল মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবল। আমি আহমাদের মুখ পানে চেয়ে আছি।

আহমাদ বলতে শুরু করল, 'এইভাবে প্রশ্ন করতে শুরু করলে অনেক প্রশ্ন আসবে। যেমন : **(ক)** আল্লাহ তাআলা কুরআনে এবং নবী করীম ﷺ হাদীছে সূদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীছে কোথাও সূদী কোম্পানিদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে কি ব্যাংক, এল.আই.সি[৬], ইন্সুরেন্স, পি.এফ ইত্যাদির সূদকে বৈধ বলতে পারা যাবে? **(খ)** আল্লাহ তাআলা কুরআনে এবং নবী করীম ﷺ হাদীছে যেনাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীছে কোথাও কোন দেশের মেয়ে, কোন জাতের মেয়ে, কোন ধর্মের মেয়ে, কোন রংয়ের মেয়ে, আরাবিয়ান না ইন্ডিয়ান? ছোট না বড়? কিছুই বলা হয়নি। তাহলে কি ছোট জাতের মেয়ের সঙ্গে যেনা করলে বৈধ বলা যাবে?[৭]

নিশ্চয়ই নয়। এ ব্যাপারে কিছু মূলনীতি রয়েছে। আর কুরআন তো কোনো খাদ্য তালিকার গ্রন্থ নয় যে, একে একে নাম ধরে উল্লেখ করবে এটি হালাল অথবা এটি হারাম। পৃথিবীতে কত খাদ্যবস্তু, ফলমূল, শাকসবজি, শস্য, পানীয় আছে। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য মানব জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ। যদি নাম ধরে ধরে উল্লেখ করা হতো, তাহলে কুরআনের কলেবর কত বেশি হতো, জাস্ট একবার ভেবে দেখ?'

আমি কাফিলের মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, সে চিন্তার রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। হয়তো ভাবছে, এইভাবে কুরআনে এলে কুরআনের ভলিয়ম কত হতো?

আহমাদ পুনরায় বলতে শুরু করল, 'এজন্যই ইসলামী শরীআত যাবতীয় খাদ্যকে খাবীছ ও তাইয়েব (পবিত্র ও অপবিত্র)-এ দুই ভাগে ভাগ করেছে। যা তাইয়েব তা হালাল, আর যা খাবীছ তা হারাম। উল্লেখ হয়েছে 'তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল সাব্যস্ত করেন আর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম সাব্যস্ত করেন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৫৭)*।[৮]

'এখন বল তো, ধূমপান অর্থাৎ বিড়ি, সিগারেট এগুলো পবিত্র না অপবিত্র?'

সুরজ ও কাফিল কী বলবে ভাবছে! আমি হেসে বললাম, 'পবিত্র হলে কী কেউ পায়খানাতে বসে পান করে!'

---

৪. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ, 'খুতবাতুল ইসলাম, (প্রকাশনায় : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৩৭১।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. এল.আই.সি: Life Insurance Corporation of India সংক্ষেপে LIC বা এল.আই.সি। বাংলা: **ভারতীয় জীবন বীমা নিগম।** এটি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীমা ও বিনিয়োগকারী সংস্থা।

৭. মাসিক সরলপথ (প্রকাশনায় : সরলপথ এডুকেশনাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, উমারপুর, মুর্শিদাবাদ, আগস্ট-২০১৪), পৃ. ১০।

৮. আবু তাহের মিছবাহ, ইসলামকে জানতে হলে (প্রকাশনী : দারুল কলম প্রকাশনী), পৃ. ৩৩০।

আহমাদ বলল, 'পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই ব্রো!'

কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক টয়লেটে বসে ভালো খাবার খেতে পারে না। এদের কর্মই প্রমাণ করছে যে, এটি অপবিত্র বস্তু তথা খাবীছ, যা হারাম।

এখনকার আলেমগণ ধূমপানকে কেন হারাম বলেছেন, দলীলসহ আমি তার আলোচনা করব। তার আগে মাকরূহ বিষয়ে একটু আলোচনা করে নিই, তাহলে অনেক সংশয় দূরীভূত হবে ইনশা-আল্লাহ!

'আচ্ছা! তোদের মধ্যে কেউ বলতে পারবি, 'মাকরূহ' মানে কী?' আহমাদ বলল।

কাফিল বলল, 'না। সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে পরিভাষাটা মওলানাদের মুখে শুনেছি। তাতে বুঝেছি যে, হারাম নয়, খেলে কোনো পাপ হবে না'।

'ঠিক মাকরূহ কাজ করলে কোনো পাপ হবে না। তবে ফিক্বহের পরিভাষায় মাকরূহ কী তা বুঝিয়ে বলছি'। আহমদ বলল।

'মাকরূহ শব্দের আভিধানিক অর্থ : ঘৃণিত, নিন্দনীয়, অপছন্দনীয়। ফিক্বহের পরিভাষায় : 'শরীআত প্রণেতা যা সাধারণভাবে করতে নিষেধ করেন, আবশ্যিকভাবে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নয়, তাকে মাকরূহ বলে'। মাকরূহ কাজ আনুগত্যের ভিত্তিতে বর্জনকারী ছওয়াব পাবে এবং তা পালনকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে না।[৯]

আচ্ছা! এইবার বল তো, কোনো ভালো মানুষ, যে কোনো নিন্দনীয় কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে পারে?'

'না'। আমি বললাম।

'তাহলে যারা বিড়ি, সিগারেট অর্থাৎ ধূমপান করে, তারা কি মাঝে মধ্যে করে, নাকি রেগুলার করে?'

'রেগুলার করে'। সুরজ বলল।

'তাহলে নিন্দনীয় কাজ যদি কেউ রেগুলার করে, তাদের কী বলা হবে? এজন্যে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফতওয়া দেওয়া হয়েছে যে, এই বলে আহমাদ তাঁর মোবাইল থেকে দুটি ফতওয়া লিঙ্ক ওপেন করে দেখালো। যাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, 'Smoking cigarette for enjoyment without a habit is makrooh (undesirable), if one insists on it and smokes regularly which may be injurious to his health, then smoking cigarette is unlawful (haram)'.[১০]

'The tobacco which causes intoxication is haram as the hadith says: every intoxicant is haram. But, the tobacco which is smelly (not intoxicant) it is makrooh (undesirable) while one which is free from intoxication and bad smell is lawful'.[১১]

'যার সারমর্ম হলো, সিগারেট কেউ যদি অভ্যাস ছাড়া বিনোদনের জন্য পান করে, সেটা মাকরূহ। আর যদি কেউ রেগুলার পান করে, যা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করবে, তা হারাম। আবার তামাকের ক্ষেত্রে যেটিতে মাদকতা রয়েছে, সেটি হারাম। তবে মাদকতা না থাকলে সেটি হবে মাকরূহ'।

আমি বললাম, 'কিন্তু কেউ তো এইভাবে বলে না। ঢালাওভাবে ধূমপানকে মাকরূহ বলে দেয়'।

'হ্যাঁ, এটা মনে হয় নিজেদের অপকর্মকে চাপা দেওয়ার জন্য মাসআলাটিকে হালকাভাবে উপস্থাপন করে। আবার হতে পারে, নিজেরা এর সাথে যুক্ত অথবা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দান সাদরে গ্রহণ করে। তাই হারাম শব্দ ইউজ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়'।

'সে যাইহোক, বর্তমানে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম আমাদের উপমহাদেশ বা এর বাইরের কান্ট্রির 'ধূমপান হারাম' মর্মে একাধিক ফতওয়া ইস্যু করেছে। সেই কারণগুলো বিশ্লেষণ করে শোনাচ্ছি, 'শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে জামীল যাইনু, 'ইসলামী জীবন পদ্ধতি'[১২] নামে একটি পুস্তক লিখেছেন। সেখানে তিনি প্রায় ১০টি দলীল উপস্থাপন করে ধূমপান হারাম, তা প্রমাণ করেছেন। আমি তার মধ্যে থেকে বিশেষ বিশেষ পয়েন্টগুলো উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

---

৯. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালিহ আল-উছায়মীন (রহিমাহুল্লাহ), ফিক্বহের মূলনীতি (প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ), পৃ. ১৮-১৯।

১০.https://darulifta-deoband.com/home/en/Halal--Haram/4803.

১১.https://darulifta-deoband.com/home/en/Food--Drinks/8136.

১২. 'শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু'-এর লেখা 'ইসলামী জীবন পদ্ধতি' বইটি আরবী ভাষায় লেখা। মূল গ্রন্থের নাম 'তাওজীহাত ইসলামিয়া'। বাংলা অনুবাদকের নাম 'মতীউর রহমান আব্দুল হাকীম সালাফী'। ডাউনলোড লিংক:
http://islamicmediabd.com/index.php/others book/person-social-civics-books/3148-islami-jibon-poddoti.

www.al-itisam.com

ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য

-শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ*

পৃথিবীতে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্যকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম শিরকের সূচনা হয়েছে। মানুষের ঈমান, আমল ও চরিত্র বিধ্বংসী যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য। মানুষের অন্তর সাধারণত অদৃশ্য বিষয়ের চেয়ে দৃশ্যমান বস্তুর দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষেরা বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহকে বাদ দিয়ে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য পূজা বা ইবাদত শুরু করেছে, যা সম্পূর্ণ হারাম ও শিরক। নিম্নে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্যের শরীআতের বিধান শীর্ষক বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো।

ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরির ইতিহাস :

আদম আলাইহিস সালাম-এর জীবদ্দশায় কেউ মূর্তি-ভাস্কর্য পূজায় লিপ্ত হয়নি। তার মৃত্যুর পরে নূহ আলাইহিস সালাম-এর আমলে মানুষেরা মূর্তি-ভাস্কর্য পূজার মতো শিরকী কাজে লিপ্ত হয়েছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِيْ كَانَتْ فِيْ قَوْمِ نُوْحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوْثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِيْ غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوْقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ فَلَمَّا هَلَكُوْا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوْا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِيْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ أَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوْا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُوْلَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে প্রতিমার পূজা নূহ আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের মাঝে চালু ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। 'দুমাতুল জান্দাল' নামক জায়গার কালব গোত্রের একটি দেবমূর্তির নাম হচ্ছে ওয়াদ, সূওয়াআ হলো হুযায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগূছ ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরবর্তীতে তা গুতায়ফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল ক্বওমে সাবার নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থান। ইয়াঊক ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, নাসর ছিল যুলকালা গোত্রের হিময়ার শাখার মূর্তি। এগুলো ছিল নূহ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের কয়েকজন সৎ ব্যক্তি। তারা মারা গেলে শয়তান তাদের ক্বওমের লোকদের অন্তরে এই চিন্তার উদ্রেক করল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন করো এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ করো। তারা তাই করল। কিন্তু তখনোও ওই সব মূর্তির পূজা করা হতো না। অতঃপর যখন মূর্তি স্থাপনকারী ওই লোকগুলো মারা গেল এবং মূর্তিগুলোর প্রকৃত বাস্তবতার ধারণা বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দেয়।[১]

ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ : কুরআনে মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ৪টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-

ক. ছানাম (الصنم) : মূর্তি, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি।[২]

কাঠ, মাটি, স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দ্বারা বানানো কোনো কিছুর প্রতিকৃতি বা মূর্তি, যা পূজা করা হয় তাকে ছানাম বলে। বাংলায় বলে মূর্তি। ইংরেজিতে Idol.[৩] কুরআনে কয়েকটি জায়গায় ছানাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দু'আ সম্পর্কে বলেন, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ 'যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার পালনকর্তা! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি (ছানাম) পূজা থেকে দূরে রাখুন' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৫)*।

খ. তিমছাল (التمثال) : মূর্তি, প্রতিমা, প্রতিচ্ছবি, আকৃতি।[৪]

মানুষ অথবা পশুর আকৃতির অনুকরণে যা কিছু তৈরি করা হয়, তাকে তিমছাল বলে। ইংরেজিতে Bust.[৫] কুরআনে তিমছাল শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ 'যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো (তিমছাল) কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছো' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৫২)*।

গ. অছান (الوثن) : প্রতিমা, মূর্তি, পুতুল।[৬]

কোনো কিছুর চেহারা থাকুক বা না থাকুক সকল ইবাদতকৃত জিনিসকে অছান বলা হয়। ইংরেজিতে Fetish.[৭] মানুষের

* কুল্লিয়া (শেষ বর্ষ), আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯২০, আ.প্র., ৪৫৫১, ই.ফা., ৪৫৫৫।
২. আল-মু'জামুল ওয়াফী (৮ম সংস্করণ, মে ২০১১), পৃ. ৬৩৬।
৩. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition : January 2014), P. 430.
৪. আল-মু'জামুল ওয়াফী (৮ম সংস্করণ, মে ২০১১), পৃ. ৩২০।
৫. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition), p. 127.
৬. আল-মু'জামুল ওয়াফী (৮ম সংস্করণ, মে ২০১১), পৃ. ১১১৯।

প্রতিকৃতি, পশুর মূর্তি, কবর, গাছ, পাথর প্রভৃতি। এই আলোকে ছানাম-তিমছালও অছানের অন্তর্ভুক্ত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অছান শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا 'তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল প্রতিমারই (অছান) পূজা এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ' *(আল-আনকাবূত, ২৯/১৭)*।

ঘ. নাহাত (النحت) : ভাস্কর্য, ভাস্কর্য তৈরি, রূপ প্রদান, কর্তন।[৮] খোদাইকৃত চিত্র শিল্পকে আরবিতে نحت বলা হয়। যাকে বাংলায় বলা হয় ভাস্কর্য। ইংরেজিতে একে Sculpture.[৯] পবিত্র কুরআনে এসেছে, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ 'সে বলল, তোমরা স্বহস্তে নির্মিত পাথরের (মূর্তি-ভাস্কর্য) পূজা করো কেন?' *(আস-সাফফাত, ৩৭/৯৫)*।

মূর্তি ও ভাস্কর্য কি ভিন্ন জিনিস?

আজ কতিপয় জ্ঞানপাপী দাবি করছে যে, ভাস্কর্য ও মূর্তি এক জিনিস নয়। যার উপাসনা করা হয় তা মূর্তি। আর যা স্রেফ সম্মানের জন্য তৈরি করা হয় তার নাম ভাস্কর্য। তাই মূর্তি তৈরি করা হারাম ও পাপের কাজ হলেও ভাস্কর্য তৈরি করা জায়েয। এটা শরীআতের উপর চরম মিথ্যাচার। রাসূল ﷺ-এর ঘরের দরজার সামনে মানুষের প্রতিকৃতি (ভাস্কর্য) এবং ঘরের ভিতরে পাতলা লাল পর্দায় কিছু প্রতিকৃতি নকশা থাকায় জিবরীল সেই ঘরে প্রবেশ করেননি। বরং দরজার সামনে থাকা ভাস্কর্যটির মাথা কেটে ফেলে গাছের মতো করে দিতে এবং পর্দাটি ছিঁড়ে ফেলে অসম্মানজনক ব্যবহারের জন্য দু'টো গদি বানাতে নির্দেশ দেন।[১০] যে সকল জ্ঞানপাপীরা মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর শৈশবকালের খেলনার পুতুল ও ঘোড়া দিয়ে ভাস্কর্যের বৈধতা প্রমাণের হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এই হাদীছগুলো তাদের পদলেহনের রঙ্গিন চশমা ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হয় না?

মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণকারীর বিধান :

মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণকারীকে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُونَ 'ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের'।[১১] এমনকি যেখানে মূর্তি-ভাস্কর্য থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা পর্যন্ত প্রবেশ করে না। আবূ ত্বালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ '(রহমতের) ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে কুকুর রয়েছে এবং সে ঘরেও না যাতে আছে (প্রাণীর) ছবি'।[১২] তবে গযব কিংবা মৃত্যুর ফেরেশতা সবখানেই প্রবেশ করে। কারণ তারা প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনে সদা প্রস্তুত *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ফুল-ফলের ছবি তোলা ও নির্মাণ করা বৈধ।[১৩]

মাথাবিহীন প্রাণীর ছবি :

যে কোনো ধরনের প্রাণীর পূর্ণ ছবি অঙ্কন কিংবা নির্মাণ করা হারাম। তবে মাথাবিহীন প্রাণীর ছবি তৈরি করা বা রাখা যাবে।[১৪]

মুসলিমের জন্য মূর্তি ও ভাস্কর্য পাহারা দেওয়ার বিধান :

একজন মুসলিমের জন্য ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য পাহারা দেওয়া হারাম। তৈরি, ক্রয়-বিক্রয়, বাজারজাত করা তো বহু দূরের কথা।[১৫] অনুরূপভাবে মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি পাহারা দেওয়াও হারাম। কেননা আল্লাহ পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(আল মায়েদা, ৫/২)*। এমনকি কেউ যদি মনে করে মূর্তি-ভাস্কর্য পাহারা দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে *(আস-সাজদাহ, ৩২/২২)*। এক্ষেত্রে তাকে পুনরায় তওবা করে কালেমা পাঠ করতে হবে।

শেষকথা :

ইসলামী শরীআতে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরি, ক্রয়-বিক্রয় কিংবা এতে সহযোগিতা করা স্পষ্ট শিরক। অতএব রাষ্ট্রীয়ভাবে অশ্লীল ছবি এবং সব ধরনের মূর্তি ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি এর ক্ষতিকর দিকগুলো জাতির সম্মুখে বারংবার উপস্থাপন করে জনগণকে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ রইল। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ছবি-মূর্তি ও ভাস্কর্য থেকে হেফাযত করে তাওহীদভিত্তিক জীবনযাপন করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৭. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition), p. 335.
৮. আল-মু'জামুল ওয়াফী (৮ম সংস্করণ, মে ২০১১), পৃ. ১০৫৮।
৯. Oxford Advanced Learners Dictionary (Third Edition), p. 710.
১০. তিরমিযী (আল মাদানী প্রকাশনী), হা/২৮০৬।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬১০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৯; মিশকাত, হা/৪৪৯৭।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩৬।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/২২২৫; আহমাদ, হা/৩৩৯৪।
১৪. তিরমিযী (আল মাদানী প্রকাশনী), হা/২৮০৬।
১৫. সূরা আল-কাফিরূন, ১০৯/৭; ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬১।

হিজাবের অসীলায় বাঁচল প্রাণ

-মুহাম্মদ সাজিদ করিম*

২৫ মে, ১৯৭৯। 'হালা আতিক' জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। সাদা তুলোর মতো মেঘগুলো অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে। সরাসরি সূর্যের আলোয় চকচক করছে বিমানের পাখা দুটো। প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে ঘোরার আনন্দ, বিমানে চড়ার মজা দুটোই তার ম্লান হয়ে গেছে মায়ের বকুনিতে। গতকালকে থেকে শুরু করেছে, এখনো থামেনি।

অবশ্য হালার মাকেও দোষ দেওয়া যায় না। তার মেয়ের 'গোঁড়ামি' ও একগুঁয়েমির জন্য পুরো পরিবারের ওপর এক ভয়াবহ বিপদ নেমে এসেছে। তার হাতের সব টাকা-পয়সা শেষ, ভবিষ্যতের চিন্তায় এখন তার চোখে অন্ধকার।

শুরু থেকে বলা যাক। মাসখানেক আগে হালার বাবা তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের খবরটা পান- অ্যামেরিকায় তার চাকরি নিশ্চিত হয়েছে। গত তিন সপ্তাহ আগেই তিনি একা চলে আসেন কর্মক্ষেত্র ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলসে বাকি পরিবারের আসার বন্দোবস্ত করতে। সিরিয়াতে তাদের সম্পত্তির বেচা-বিক্রির শেষ কাজটুকু করে হালার মা রওনা দেন আমেরিকা। সঙ্গে তার তিন মেয়ে এবং চার ছেলে।

হালার বাবা যাতায়াতের সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। সিরিয়া থেকে বিমানটি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তাদের নামিয়ে দেয় পূর্ব উপকূলের নিউইয়র্ক শহরে, জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এখানে প্রথমে তাদের অভিবাসন নিয়ম অনুযায়ী গ্রীন কার্ড করতে হবে। এরপর একটি নির্দিষ্ট বিমানে চড়ে তাদের যেতে হবে শিকাগো। সর্বশেষ এখান থেকে একটি ফ্লাইটে তারা পৌঁছাবে লস এঞ্জেলস।

ঝামেলাটা বাঁধল নিউইয়র্কে গ্রীন কার্ড করার সময়। নিয়ম অনুযায়ী হালার মা এবং তার দুই বোন মাথার কাপড় খুলে ছবি তুললেও ১৩ বছর বয়সী হালা আতিক বেঁকে বসল। 'আমি আমার রবের আদেশ অমান্য করে মাথার হিজাব খুলে ছবি তুলব না'।

দায়িত্বে থাকা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, হিজাব পরে ছবি তোলার বিধান নেই। অতএব তাকে হিজাব খুলেই ছবি তুলতে হবে। কিন্তু সে অনড়। এবার তার মা আর দুই বোন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল; কিন্তু তাতেও কাজ হলো না।

ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা এবার তাকে আলাদা করে ডেকে পেছনে নিয়ে গেল। তাকে বোঝানো হলো গ্রীন কার্ডের জন্য এখন পর্যন্ত কাউকেই হিজাবসহ ছবি তুলতে দেওয়া হয়নি। হুমকি দেওয়া হলো তাকে সিরিয়াতে ফেরত পাঠানো হবে। ঘটনা জটিল দিকে মোড় নিতে থাকায় ধীরে ধীরে সেখানে কর্মকর্তাদের ভিড় বাড়তে লাগল। হালা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আপনারা যত জনকেই নিয়ে আসেন বা আমাকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন, আমি হিজাব খুলে ছবি তুলব না।

অবশেষে তিন ঘণ্টা পর ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা হাল ছেড়ে দিল। উপরে কথা বলে তারা মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কাউকে হিজাবসহ ছবি তুলতে দিল।

কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। শিকাগোগামী যে ফ্লাইটে তাদের আট জনের টিকিট করা ছিল সেটি ইতোমধ্যে চলে গেছে। কালকে ছাড়া যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে। আর এতগুলো টিকিটের মূল্যও কম নয়। মা সারারাত ধরে মনের ক্ষোভ ঝাড়লেন হালার উপর। ওদিকে কোনো খবর না পেয়ে তার বাবাও নিশ্চয় অনেক দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

পরদিন অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পেরিয়ে আট জনের দলবহর পৌঁছালো লস অ্যাঞ্জেলস বিমানবন্দরে। সেখানে নামতেই হালার বাবা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে তাদেরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যেভাবে আর কোনো দিন ধরেননি। কারণ কী? ঘটনা হলো, দেরি না হলে তাদের যে ফ্লাইটে ওঠার কথা ছিল, আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট #১৯১, শিকাগোতে সেটি বিধ্বস্ত হয়ে ২৫৮ জন যাত্রীর সবাই মারা গেছে। সেই প্লেনে থাকা একটি প্রাণীও বাঁচেনি। একটি কিশোরী মেয়ের ইখলাছ এবং আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দার ব্যাপারে তার শক্ত অবস্থানের অসীলায় আল্লাহ তার পুরো পরিবারকে হেফাযত করলেন। শুধু তাই না, তার ভাতিজির সুবাদে এই গল্প ছড়িয়ে পড়ার পর তা অনেক বোনের পর্দাতে ফিরে আসার অসীলা হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ১০ জন অমুসলিম তার ঘটনা শুনে ইসলাম কবুল করেছেন।

এ ঘটনা থেকে শেখার অনেক বিষয় আছে। আমরা শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করব। আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হওয়া এবং তার উপরে তাওয়াক্কুল করা। আমরা যদি আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে সৎ থাকি, তিনিই আমাদের পদে পদে সাহায্য করবেন। আপাতদৃষ্টিতে যে বিপদগুলো সামনে আসে, সেগুলোর পেছনে এমন কল্যাণ থাকে, যা আলিমুল গায়েব আল্লাহ জানেন, আমরা জানতে পারি না। অনেক সময় সামনে বাধা দেখে আমরা থমকে যাই। দ্বীন পালনের ব্যাপারে নিজেদের আলস্য, কাপুরুষতা বা অপারগতার ঢাল হিসাবে যেন আমরা হিকমত শব্দটি ব্যবহার না করি। আমাদের মাঝে অনেকে এ শব্দের অপব্যবহারকে নিজ প্রবৃত্তির দাসত্বের লাইসেন্স বানিয়ে নিয়েছে। দ্বীনের কোনো বিধান পালন করা আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন মনে হলেও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এর উপর অটল থাকা উচিত।

'তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে, এটি দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন' (আত-তালাক, ৬৫/২)।

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

www.al-itisam.com

কবিতা

লড়াই!

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ছাপ রেখে যাও
আগামীর পথিকের দিশা রেখে যাও।
রক্তসাগর সাঁতরে এসেছো হেথা তুমি
ঝড়-সাইক্লোনের বুকে অপরাজিত কেতন তুমি।
নিশান গেঁড়ে যাও শত্রু –আঁধারে তুমি টুটোনি
ভিত-কাঁপা কলুষিত আঘাতে তুমি হারোনি।
ঘুচিবে আঁধার, ভঙ্গুর গম্বুজে দুলিবে পতাকা
তব গোরস্থানে ফের উত্তীর্ণ হবে বিজয় পতাকা।

একটি সূরা লেখো!

-জহুরুল ইসলাম
পোরশা, নওগাঁ।

দুঃসাহস বড় দেখেছি তোমার, অনেক সাহসী তুমি
ক্ষমতার দাপটে চুপসিয়ে রাখো, দাবিয়ে রাখো সবি।
সবাই তোমাকে ভয় করে চলে, সাহস বড়ই বেশি
মসনদে বসে করছ তুমি ক্ষমতার রেষারেষি।
দুঃসাহস তোমার বড়ই বেশি, পাল্টাতে চাও কুরআনের বাণী
উপর থেকে তামাশা কি তোমার দেখবেন তিনি?
কে তুমি সাহসী বুদ্ধিমান কতো, কুরআনকে চাও পাল্টাতে
ছোট্ট একটি সেনার আঘাতে হানল ফাটল মসনদে।
কে বীর তুমি রোধিতে চাও পর্দা, হিজাব, পাঞ্জাবি?
কে তুমি সংস্কারক পাল্টাতে চাও মুসলিমের রীতিনীতি?
নারী-পুরুষ সবার পর্দায় দাও না কেন ভয়-ভীতি?
কে তুমি বলো ক্ষমতাধর বিশ্ব চাও হাতের মুঠে
অসহায়দের দাবাতে চাও, চেপে রেখে পায়ের বুটে?
কে তুমি বলো প্রভু হতে চাও কারুন, নব ফেরাউন
বিশ্ব যখন শাসিতে চাও, মসনদে তোমার আগুন!
কে তুমি বলো শক্তিশালী, শক্তি আছে কত তোমার?
মেরে ফেলো তুমি মুসলিম আর ভেঙে ফেলো ঘর প্রার্থনার!
কে তুমি বলো খেতে চাও সব, খাওনা তুমি যত পার
বাদুড় খেয়ে করোনার ভয়ে গদি থেকে কেন দৌঁড় মার?
তুচ্ছ সৃষ্টি ভাইরাস একটি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র
তার ভয়ে শুধু কেন জেগে আছ, বিশ্ব আছে অতন্দ্র?
ছোট্ট একটি সেনার আঘাতে অচল যান্ত্রিক প্রভু
যে হলো এই সেনা কমান্ডার জানো কি তারে কভু?
তার কুরআনের ব্যাপারে যদি সন্দেহ তোমার থাকে
এ রকম নির্ভুল একটি সূরা লিখে দেখাও আগে!

আমার দেশ

-শাকিব হুসাইন
শিক্ষার্থী, দিনাজপুর সরকারি কলেজ,
খানসামা, দিনাজপুর।

আকাশ নীলে উড়ছে পাখি
কিচিরমিচির ডাকছে,
এই অপরূপ সোনার দেশে
সোনালি ধান পাকছে।
সবুজ বনে গাছ-গাছালি
সবুজ পাতা খুলছে,
মৃদু হাওয়ায় সুজন মাঝি
খেয়া নৌকা বাইছে।
এই অপরূপ দেশটা আমার
মহান প্রভুর দান,
দিনে-রাতে গাইবো প্রভু
তোমার গুণগান।

পরিবেশটা খুব ঘোলাটে

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনাখিলা, শেরপুর।

মানুষগুলো অমানুষ আজ
ব্যবহারের গুণে,
লোভে পড়ে ক্ষোভের তরে
হিংসা দানা বুনে।
কারও ভালো কেউ চাহে না
কেমনে বড় হবে,
ঠকের ব্যবসা নিত্য করে
দিচ্ছে ধোঁকা সবে।
পরিবেশটা খুব ঘোলাটে
মানুষ যায় না চেনা,
অন্ধমোহে দ্বন্দ্ব লেগে
বাড়ছে কত দেনা।

বাংলাদেশ সংবাদ

করোনার প্রভাবে বন্ধ ৮ হাজারেরও বেশি কারখানা

শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) তালিকায় থাকা কারখানার সংখ্যা ৫৮ হাজার ৮৩৬টি। প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ৮ হাজার ২৯টি। বন্ধ হওয়ার তালিকায় থাকা কারখানার মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের ৭১৩টি কারখানা বন্ধ হয়েছে; আর অন্য খাতের রয়েছে ৭ হাজার ৩১৬টি। বন্ধ হওয়া এসব কারখানার অধিকাংশের ক্ষেত্রেই মার্চ মাসে শুরু হওয়া করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়েছে। ডিআইএফইর তথ্য অনুযায়ী, বন্ধ হওয়া এসব কারখানায় শ্রমিক ছিল ১৭ লাখ ১০ হাজার ২২১ জন। কারখানা বন্ধ হওয়ায় এসব শ্রমিকেরও চাকরি হারানোর কথা।

ভুটানের সাথে শুরু হচ্ছে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য

স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া দেশ ভুটানের সাথে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করেছে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে দুই দেশের বেশ কিছু পণ্য একে অপরের বাজারে শুল্ক ছাড়াই প্রবেশ করবে। এই চুক্তির ফলে দুই দেশই শুল্কমুক্ত আমদানি-রফতানির নানা সুবিধা পাবে। সম্প্রতি বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যে এই মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের তথ্য মতে, বাংলাদেশের সঙ্গে এখন ১৯৮টি দেশের বাণিজ্য রয়েছে। এর মধ্যে ৭১টি দেশের সঙ্গে রয়েছে বাণিজ্য ঘাটতি। বিশাল এ ঘাটতি কমাতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এফটিএ এবং পিটিএ সইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

ভুটানের সঙ্গে এফটিএ এর বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ- সিপিডির গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বাংলাদেশ প্রথম কোনো দেশের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি করতে যাচ্ছে। এটা থেকে আমরা বুঝতে পারব, ভবিষ্যতে অন্য দেশগুলোর সঙ্গে কোন কোন জায়গায় গুরুত্ব দিতে হবে। এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের সঙ্গে এফটিএ করতে গিয়ে কাজে লাগানো যাবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

মহামারিতে হতদরিদ্র বেড়েছে ৪০ শতাংশ : জাতিসংঘ

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্ব জুড়ে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বেড়েছে, যাদের মানবিক সাহায্য প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। আগামী বছর (২০২১) থেকেই এ সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে এবং এজন্য জাতিসংঘ ৩ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার চেয়েছে। ১ ডিসেম্বর ২০২০, মঙ্গলবার জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা মার্ক লোকক বলেন, আগামী বছর (২০২১) যাদের মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে, তারা সবাই যদি একটি দেশে বাস করতেন তাহলে সেটি বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশ হতো। এই মহামারি বিশ্বের সবচেয়ে ভঙ্গুর ও ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনীতির দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। জাতিসংঘ ২০২১ সালে ৫৬টি দেশে মানবিক ত্রাণ পৌঁছে দিতে ৩৪টি পরিকল্পনা করেছে। সংস্থাটি এর মাধ্যমে ১৬ কোটি মানুষের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে চায়। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি মানুষকে ক্ষুধা, যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং করোনা ভাইরাস মহামারির প্রভাব ভোগ করতে হচ্ছে। লোকক বলেন, এ বছর (২০২০) দাতা দেশগুলো রেকর্ড ১ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার দান করেছে। যা দিয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের কাছে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ২০২১ সালের জন্য আমাদের ৩ হাজার ৫০০ কোটি (৩৫ বিলিয়ন) ডলার প্রয়োজন; এটি বিশাল অঙ্কের অর্থ। কিন্তু ধনী দেশগুলো তাদের জনগণকে সুরক্ষা দিতে যে পরিমাণ ব্যয় করছে, তার তুলনায় এই অর্থ খুবই সামান্য।

কাশ্মীর নিয়ে ওআইসি শক্ত অবস্থানে : ক্ষুব্ধ ভারত, খুশি পাকিস্তান

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে ৫৭টি মুসলিম দেশের জোট ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দুদিনের এক বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যাতে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলকে বেশ শক্ত ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। এমনকি গত বছর ৫ আগস্টের ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্যও ভারতকে আহ্বান জানানো

হয়েছে। একই সাথে ভারত-শাসিত কাশ্মীরে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারত যেভাবে কাশ্মীরে আন্তর্জাতিক এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করছে এবং আন্তর্জাতিক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছে, তার বিবেচনায় ভারতের সাথে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে ওআইসির প্রস্তাবে। ওআইসি আবারও বলেছে কাশ্মীর একটি অমীমাংসিত ইস্যু এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে কাশ্মীরিদের অধিকারের বিষয়টি জাতিসংঘের এজেন্ডাতে থাকলেও গত ৭০ বছর ধরে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। পাকিস্তান গত দেড় বছর ধরে ওআইসিকে কাশ্মীর নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়ার কথা বলেছিল আর তার ভিত্তিতেই এই প্রস্তাবে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারত সরকার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ওআইসির প্রস্তাব নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে খুব শক্ত ভাষায় এই প্রস্তাবনার বিরোধিতা করা হয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে আরও ৪টি বসতি স্থাপনের অনুমোদন ইসরাঈলের

অধিকৃত ফিলিস্তীনী পশ্চিম তীরে আরও চারটি অবৈধ ইয়াহূদী বসতি নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে তেল আবিব। এছাড়া পবিত্র জেরুজালেম শহরের উত্তরে আরও নয় হাজার ইউনিট বসতি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইসরাঈল এবং ফিলিস্তীনের গণমাধ্যম এ খবর দিয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ২০২০, রবিবার ইসরাঈলের পরিবহনমন্ত্রী মিরি রেজেভ পশ্চিম তীরে নতুন চারটি বসতি নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন দেন। ইসরাঈলের চ্যানেল ইলেভেনের বরাত দিয়ে ফিলিস্তীনের মা'আন সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, জেরুজালেম শহরের পৌরসভা সেখানে ইয়াহূদীদের জন্য নয় হাজার বসতি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সূত্র অনুযায়ী, জেরুজালেম শহরের পরিত্যক্ত বিমানবন্দরের কাছে কয়েক হাজার ইউনিট বসতি নির্মাণ করা হবে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় ওই এলাকা দখল করে নেয় ইসরাঈল। কয়েক বছর আগে জেরুজালেম শহরের এ নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপের কারণে কয়েক বার তা স্থগিত করে তেল আবিব।

আমি যীশুকে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছি মুহাম্মাদ ﷺ-কে : লরেন বুথ

২০১০ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন লন্ডনের প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক ধর্মান্তরিত মুসলিম লরেন বুথ। তিনি বলেন, আমি সেখানে যীশুকে খুঁজতে গিয়েছি, কিন্তু মানুষের আচরণের মধ্যে আমি মুহাম্মাদ ﷺ-কে খুঁজে পেয়েছি। তিনি তার জীবনের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন তার আত্মজীবনী ভিত্তিক বই 'ফাইন্ডিং পিস ইন দ্য হলি ল্যান্ড' এ। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি যীশুর উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলিনি; বরং ফিলিস্তীন সফরের সময় তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে এমন এক সত্তা খুঁজে পেয়েছি, যা এর আগে সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। আমি মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে জানতাম না। কারা আরব ভূমিগুলো দখল করে আছে, সে সম্পর্কেও কিছু জানতাম না। আমি আরবদের সম্পর্কে ভীত ছিলাম। ফিলিস্তীনীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লেখালেখি করতে চাওয়ার কথা জানান লরেন বুথ, যার মাধ্যমে তাদের বার্তা সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছায়।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে চাঁদে পতাকা ওড়ালো চীন

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসাবে চাঁদের পৃষ্ঠে নিজেদের পতাকা স্থাপন করেছে চীন। চীনের পতাকাটি দুই মিটার চওড়া এবং ৯০ সেন্টিমিটার লম্বা বলে গ্লোবাল টাইমসকে জানিয়েছেন প্রকল্পটির নেতৃত্ব দেওয়া লি ইয়ুনফেং। মহাকাশযান চ্যাং'ই-৫ চাঁদের পৃষ্ঠের মাটি ও পাথরের নমুনা নিয়েছে। চীনের প্রথম চন্দ্রাভিযানে যাওয়া মহাকাশযান চ্যাং'ই-৩ থেকে তোলা ছবিতে চাঁদের পৃষ্ঠে প্রথমবার চীনের পতাকা দেখা যায়। ২০১৯ সালে চ্যাং'ই-৪ মহাকাশযান চাঁদের অন্ধকার পৃষ্ঠেও চীনের পতাকা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে ওই দু'বারের কোনোবারই আক্ষরিক অর্থে কাপড়ের তৈরি পতাকা ছিল না। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত গ্লোবাল টাইমস পত্রিকা তাদের খবরে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো মিশনের সময় অনুভূত হওয়া উত্তেজনা এবং অনুপ্রেরণার কথা মনে করিয়ে দেয় চীনের পতাকাটি।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পূর্বে যে সকল ভালো কাজ করেছে পরকালে কি সে তার নেকী পাবে?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : অমুসলিম অবস্থায় কেউ যদি দান-খয়রাত, দাস মুক্তকরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাসহ সামাজিক কোনো সৎকর্ম করে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করার পর তার নেকী সে পাবে। উরওয়া ইবনুয যুবায়র বলেন, হাকীম ইবনু হেযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলী যুগে যে সকল ভালো কাজ করেছিলাম যেমন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, দাস আযাদ করা এবং দান-ছাদাক্বা করা- এ সবের ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়? আমি কি এগুলোর ছওয়াব পাব? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পূর্বে তুমি যে সকল সৎকর্ম করেছ, তার সবকিছু নিয়েই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ' (ছহীহ বুখারী, হা/২২২০; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৩)। অন্য বর্ণনায় আছে, জাহিলী যুগে তিনি ১০০ জন দাস আযাদ করেছিলেন এবং ১০০ লোককে ব্যবহারের জন্য বাহন দান করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৩৮)।

প্রশ্ন (২) : কাফেরদের পাপ কর্মানুযায়ী কি তাদের জন্য জাহান্নামের স্তর ভিন্ন হবে?

-মাজিদুল ইসলাম
ফতুল্লা, নারায়াণগঞ্জ।

উত্তর : ঈমানদারগণ যদি পাপের কারণে জাহান্নামে যায়, তাহলে সে তার অপরাধ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে কাফেরেরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা কখনো তা থেকে মুক্তি লাভ করবে না। মুমিনদের মতো তাদেরও পাপ অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তিও কম-বেশি ও প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (চিরস্থায়ী) জাহান্নামীদের মধ্য হতে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে আবূ তালেবের। তাকে দুটি আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে, এ দুটি জুতার কারণে তার মগজ পর্যন্ত উথলাতে থাকবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২১২; মিশকাত, হা/৫৬৬৮)। আবূ তালেব কাফের ছিল আর তার শাস্তি সবচেয়ে কম হবে মর্মে ছহীহ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের শাস্তিও কম-বেশি হবে।

প্রশ্ন (৩) : সংবিধানের নিয়মে 'ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামী রাষ্ট্রপতির নিকটে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারে'। এরূপ প্রাণভিক্ষা চাওয়া কি শরীআত সম্মত?

-ফরিদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হলে কেউ ক্ষমা করতেও পারবে না এবং কেউ ক্ষমা চাইতেও পারবে না। উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এক জন মহিলার চুরির শাস্তি ক্ষমার ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ করলে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে অস্বীকার করে বলেন, উসামা! তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ? (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৮)। তবে সামাজিকভাবে কারও মৃত্যুদণ্ড হলে রাষ্ট্রপতি বা কোনো দায়িত্বশীল ক্ষমা করে দিতে পারে। কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো মানুষের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারে না। কেননা হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ (আল-বাক্বারা, ২/২৫৮)।

পবিত্রতা→ওযূ-গোসল

প্রশ্ন (৪) : মোবাইল অ্যাপসে কুরআন পড়লে কি ওযূ করা লাগবে?

-নাঈমুল ইসলাম
লালমাই, কুমিল্লা।

উত্তর : না, ওযূ করা লাগবে না। সাথে সাথে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য ওযূ করা শর্ত নয়। বরং ওযূ ছাড়াও কুরআন তেলাওয়াত করা যায়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩; সুবুলুস সালাম, ১/১০২, হা/৭২)।

প্রশ্ন (৫) : নাভির নিচের লোম পরিষ্কারের জন্য ভিট (veet) ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
রাজবাড়ী সদর।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। কেননা ক্ষৌরকার্য সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিষ্কার করা। আর তা যে কোনো মাধ্যমে হোক না কেন। তবে চেঁছে ফেলা সুন্নাত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ইসলামের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঁচটি।

যথা : খাৎনা করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা ও বগলের লোম উপড়ে ফেলা' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯১; মিশকাত, হা/৪৪২০)।

ইবাদত→ছালাত

প্রশ্ন (৬) : প্রথম সিজদা থেকে উঠার পর শুধু 'রাব্বিগফিরলী' দু'আ পড়া যাবে কি?

-আব্দুর রশিদ রাসেল
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, পড়া যাবে। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুই সিজদার মাঝখানে বসে বলতেন, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ **উচ্চারণ :** রব্বিগফিরলী রব্বিগফিরলী। অর্থাৎ, হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন (নাসাঈ, হা/১০৬৯, ১১৪৫; আবূ দাঊদ, হা/৮৭৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৮৬৬; দারেমী, হা/১৩২৪; ইরওয়াউল গালীল, হা/৩৩৫)।

প্রশ্ন (৭) : বিতর ছালাতের পর অন্য কোনো ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আহমাদ আলী
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : বিতর ছালাত রাতের শেষ ছালাত হলেও তার পরে নফল ছালাত আদায় করা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিতরের পরেও দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন (তিরমিযী, হা/৪৭১; ইবনু মাজাহ, হা/১১৯৫; মিশকাত, হা/১২৮৪)।

প্রশ্ন (৮) : অনেক মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য পৃথক জায়নামাযের ব্যবস্থা থাকে। আবার অনেকেই নিজ নিজ জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করে। এতে বিশেষ কোনো নেকী আছে কি?

-আব্দুস সামাদ
আয়কর বিভাগ, রাজশাহী।

উত্তর : জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করাতে পৃথক কোনো নেকী নেই। বরং ব্যক্তিগতভাবে জায়নামায ব্যবহার করলে তাতে অনেক অসুবিধা রয়েছে। যেমন, অন্যরা তার পায়ে পা মিলাতে সংকোচবোধ করবে; ব্যক্তির মধ্যে অহংকার আসবে ইত্যাদি। তা ছাড়া জায়নামায বিছিয়ে হোক বা জায়নামায ছাড়া হোক মসজিদে কারো জন্য কোনো জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা ঠিক নয়। বরং যিনি আগে আসবেন, তিনি প্রথম কাতারে দাঁড়াবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৮; মিশকাত, হা/১০৯০)। তবে বিচক্ষণ ও দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ইমামের নিকটবর্তী ও পিছনে দাঁড়াবেন। অতঃপর অন্যরা দাঁড়াবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩২; মিশকাত, হা/১০৮৮-৮৯) যাতে করে তারা ইমামের ভুলের ক্ষেত্রে তাকে সতর্ক করতে পারেন এবং প্রয়োজনে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২২৯)। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সকল মুছল্লীর জন্য মসজিদে কার্পেট বিছানোতে শারঈ কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৯) : জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে রজব তারিখ মিরাজের রাত্রিতে যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়, তখন যোহর, আছর ও এশা দুই রাকআত করে আদায়ের বিধান ছিল। পরবর্তীতে ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত ছালাতকে চার রাকআতে উন্নীত করার আদেশ দেওয়া হয়। এ ঘটনার কোনো সত্যতা আছে কি?

-ফয়সাল
রামগতি, লক্ষীপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, এ বিষয়ে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ আছে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছালাত ফরয করা হয়েছিল দুই দুই রাকআত করে। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হিজরত করলেন। তখন তা চার রাকআত করে ফরয করা হলো এবং সফরের ছালাতকে পূর্বের অবস্থায় বহাল রেখে দেওয়া হলো' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৩৫)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কায় ছালাত ফরয করা হয়েছিল দুই দুই রাকআত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হিজরত করলেন, তখন প্রতি দুই রাকআতের সাথে দুই রাকআত বৃদ্ধি করে দিলেন, মাগরিব ব্যতীত, কারণ তা দিনের বিতর। আর ফজর ব্যতীত, কারণ এতে দীর্ঘ ক্বিরাআত করতে হয়' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬০৮৪, এই হাদীছটির সূত্র দূর্বল হলেও অর্থগতভাবে তা ছহীহ)।

প্রশ্ন (১০) : দু'আ কুনূত পাঠের পূর্বে কি বিসমিল্লাহ পড়তে হবে?

-আব্দুর রহমান
রামনগর, দিনাজপুর।

উত্তর : না, দু'আ কুনূত পাঠের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না। কেননা এর পক্ষে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন (১১) : চার রাকআতবিশিষ্ট ছালাতের প্রথম বৈঠকে ধীরস্থিরভাবে তাশাহুদ পড়ার পরেও অনেক সময় দেখি ইমাম সাহেবের তাশাহুদ পড়া শেষ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-ফজলে আহমাদ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করতে হবে। এটিই শরীআতের বিধান। ইমামের পূর্বে মুক্তাদীর তাশাহুদসহ যে কোনো দু'আ পড়া শেষ হলেও ইমামের অনুসরণ বা ইক্তেদা

করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'ইমামকে নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১৪; মিশকাত, হা/১১৩৯)। তবে এ সময়ে দরূদ পড়তে পারে।

প্রশ্ন (১২) : যারা প্রতি সপ্তাহে ঢাকায় যাতায়াত করে তারা কি ঢাকায় অবস্থানকালে ছালাত ক্বছর করবে?

রওশন আলী
বাঘা রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় তারা ছালাত ক্বছর করবে। কেননা যে কোনো প্রয়োজনে মানুষ সফরে বের হলে ছালাত ক্বছর করতে পারে। আল্লাহ তাআল বলেন, 'যখন তোমরা সফর করো, তখন তোমাদের ছালাতে ক্বছর করলে কোনো দোষ নেই। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (আন-নিসা, ৪/১০১)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলতেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে মদীনায় যোহরের ছালাত চার রাকআত পড়েছি। আর যুল হুলাইফা গিয়ে আছরের ছালাত দুই রাকআত পড়েছি (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৯০; মিশকাত, হা/১৩৩৩)। রাসূল ﷺ একটানা ১৯ দিন ক্বছর করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৪০০, ১০৮১; তিরমিযী, হা/৫৪৯; মিশকাত, হা/১৩৩৭)। অর্থাৎ, যতদিন তিনি অবস্থান করেছেন ততদিন ক্বছর করেছেন, তাই স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করে পড়া যাবে। অনেক ছাহাবী দীর্ঘ দিন সফরে থাকলেও ক্বছর করতেন (মিরকাত, ৩/২২১; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২১৩-১৪)।

প্রশ্ন (১৩) : হানাফী ইমামের পিছনে রাফঊল ইয়াদাঈন করা হলে কি ইমামকে পরিপূর্ণ অনুসরণের খেলাফ হবে?

-জামিল হোসেন
পুরাতন কসবা, যশোর।

উত্তর : ছালাতে ইমামের অনুসরণ করতে হবে একথা ঠিক। তবে ইমাম যদি রাফঊল ঈয়াদায়েনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের প্রতি আমল না করে কিংবা তা অবজ্ঞা করে তাহলে এ ক্ষেত্রে মুক্তাদী তার অনুসরণ করতে বাধ্য নন। বরং মুক্তাদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করত রাফঊল ইয়াদায়েন করেই ছালাত সম্পন্ন করবে। এতে তার পেছনে ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা রাফঊল ইয়াদায়েন শরীআতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এর প্রমাণে চার শতাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে (সিফরুস সাআদাত, পৃ. ১৫), যা প্রায় ৫০ জন ছাহাবী দ্বারা প্রমাণিত। যাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ যদি স্বেচ্ছায় তা উপেক্ষা করে তাহলে সে সুন্নাতকে অমান্য করল (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৯৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২১৩০)। উল্লেখ্য যে, ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েনের জন্য ১০টি করে নেকী বেশি হয় (সিলসিলা ছহীহা, হা/৩২৮৬)। তবে রাফঊল ইয়াদায়েন না করার জন্য ইমাম গুনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ইমাম যদি ঠিক করে তাহলে তোমরা নেকী পাবে। আর যদি ভুল করে তাহলেও তোমরা নেকী পাবে। কিন্তু ইমামের গুনাহ হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪; মিশকাত, হা/১১৩৩)।

প্রশ্ন (১৪) : কোনো মুছল্লীর দু'আ কুনূত জানা না থাকলে জামাআতে ইমাম যখন কুনূত পড়বেন তখন তার করণীয় কী?

-ইমরুজ হোসেন
ঠাকুরগাঁও সদর।

উত্তর : যার দু'আ কুনূত মুখস্থ নেই সে তা মুখস্থ করার চেষ্টা করবে। তবে বিতর পড়লেই যে দু'আ কুনূত পড়তে হবে একথা ঠিক নয়। কেননা দু'আ কুনূত ছাড়াও বিতর ছালাত পড়া যায়। তাছাড়া নিয়মিত দু'আ কুনূত পড়া বিদআত। আবূ মালেক আল-আশজাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনি রাসূল ﷺ, আবূ বকর, উমার, উছমান এবং এখানে কূফায় প্রায় পাঁচ বৎসরকাল আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছেন। তাঁরা কি কুনূত পড়েছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! এটা নতুন আবিষ্কৃত (তিরমিযী, হা/৪০২; নাসাঈ, হা/১০৮০; ইবনু মাজাহ, হা/১২৪১; মিশকাত, হা/১২৯২)।

প্রশ্ন (১৫) : চার রাকআত ছালাতের নিয়তে দাঁড়িয়ে যদি ভুলক্রমে দুই রাকআত শেষে সালাম ফিরানো হয়, তাহলে কি ঐ ছালাত পুনরায় শুরু থেকে পড়তে হবে?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : না, ঐ ছালাত পুনরায় শুরু থেকে পড়তে হবে না। বরং যে দুই রাকআত ছুটে গেছে ঐ দুই রাকআত পূর্ণ করবে। অর্থাৎ পরে দুই রাকআত যথাযথ আদায় শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদা দিবে। আবদুল্লাহ ইবনু বুহায়না রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক দিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করলেন। (দ্বিতীয় রাকআতে) তিনি না বসে উঠে দাঁড়ালে লোকজন সবাই তার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। তিনি ছালাত শেষ করলে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ছালাত প্রায় শেষ করলে আমরা তার সালাম

ফিরানোর অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বেই বসে দুটি সিজদা করলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭০; ছহীহ বুখারী, হা/১২২৪)।

প্রশ্ন (১৬) : ছালাতের কোনো এক রাকআতে সিজদার সংখ্যা একটি হলো নাকি দুটি হলো এমন সন্দেহ হলে করণীয় কী?

-মুহাম্মাদ বিল্লাল
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতে সিজদা কম হয়েছে বলে সন্দেহ হলে সিজদা করে নিতে হবে। তারপর শেষে সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। কেননা রুকূ-সিজদা ছুটে গেলে রাকআত বাতিল হয়ে যায় (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৫৩৯; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৫৩৭)। সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে মুছল্লী তার ইয়াক্বীন তথা নিশ্চিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করবে। ইয়াক্বীন হচ্ছে- ছোট সংখ্যাটি হিসাব করা। তাই সে শুধু একটি সিজদা দিয়েছে ধরে নিয়ে দ্বিতীয় সিজদাটি আদায় করবে। এরপর সালাম ফিরানোর আগে সাহু সিজদা দিবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭১; মিশকাত, হা/১০১৫)। তবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে যদি সিজদা ছুটে গেছে বলে সন্দেহ হয় বা সালাম ফিরিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে ঐ স্থানে আরেক রাকআত পড়ে নিয়ে সাহু সিজদা দিবে (শাইখ বিন বাযের ফতোয়াসমগ্র, ১১/৩০)।

ইবাদত→ছিয়াম

প্রশ্ন (১৭) : আইয়্যামে তাশরীক তথা জিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখ ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ। তাহলে ঐ মাসে আইয়্যামে বীযের ছিয়াম পালনের বিধান কী?

-নাছির উদ্দীন
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ১৩, ১৪ ও ১৫-ই যিলহজ্জ ছিয়াম পালন করা উত্তম। তবে যে কোনো দিনও তা পালন করা যায়। মুআযা রহিমাহাল্লাহ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করি, মাসের কোন কোন দিনে ছিয়াম রাখতেন? তিনি বললেন, তিনি নির্দ্বিধায় যে কোনো তিন দিন ছিয়াম রাখতেন (আবূ দাঊদ, হা/২৪৫৩)। সুতরাং আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত ছিয়াম পালন করবে।

ইবাদত→যাকাত

প্রশ্ন (১৮) : আমার একটি বাড়ি আছে। সেখানে নিম্ন আয়ের মানুষ বসবাস করে। কখনো এমন হয় যে, কোনো কোনো ভাড়াটিয়া ভাড়া দিতে পারে না এবং এক সাথে ৬-১২ মাসের ভাড়া বকেয়া করে ফেলে। এমতাবস্থায় আমি কি এসব ভাড়াটিয়াদের বকেয়া ভাড়াকে আমার যাকাত হিসাবে দেখিয়ে তার ঋণের বোঝা কমাতে পারব? এ ক্ষেত্রে তাকে জানানো কি আবশ্যক যে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হলো বা বকেয়া ভাড়া সমন্বয় করা হলো?

-কিয়া এম মিরাজ
সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় দেখতে হবে যে, সে নিঃস্ব কি-না। যদি নিঃস্ব হয়, তাহলে মাসিক ভাড়া ছেড়ে দিতে পারে। এমন কাজের বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করবে। হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে জনৈক ব্যক্তি ছিল। ফেরেশতা তার নিকট তার জান ক্বব্য করার জন্য এসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি কোনো ভালো কাজ করেছ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হলো, একটু চিন্তা করে দেখো। সে বলল, এ জিনিসটি ব্যতীত আমার আর কিছুই জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করতাম অর্থাৎ ঋণ দিতাম। আর তা আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগাদা করতাম। আদায় না করতে পারলে আমি সচ্ছল লোককে সময় দিতাম আর অভাবী লোককে ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫১)। তবে যাকাত হিসাবে দিলে তাকে জানিয়ে দেয়াই ভালো। কেননা যাকাত সবাই খেতে চায় না এবং তা সবার জন্য খাওয়া জায়েযও নয়। আত্বা ইবনু ইয়াসার রহিমাহাল্লাহ সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ধনীর জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়। তবে পাঁচ শ্রেণির ধনীর জন্য তা জায়েয। ১. আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি ২. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী ৩. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ৪. কোনো ধনী ব্যক্তির দরিদ্রের প্রাপ্ত যাকাতের মাল নিজ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা এবং ৫. মিসকীন প্রতিবেশী তার প্রাপ্ত যাকাত হতে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দেওয়া (আবু দাঊদ, হা/১৬৩৬)।

প্রশ্ন (১৯) : যাকাতের সম্পূর্ণ টাকা কি গরীব নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে?

-জাহাঙ্গীর আলম
গাজীপুর সদর।

উত্তর : আত্মীয়-স্বজন যদি নিঃস্ব হয় এবং ওশর-যাকাতের হক্বদার হয়, তাহলে তাদেরকে যাকাতের সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া

যাবে। একদা এক আনছারী মহিলা এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর স্ত্রী যয়নাব বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে জিজ্ঞেস করেন যে, তাদের স্বামীদের প্রতি এবং স্বামীদের পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি যাকাত দিলে এটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তাদের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। আত্মীয়তার নেকী এবং দানের নেকী' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০০; মিশকাত, হা/১৯৩৪)। কারণ আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণির লোককে দেওয়ার আদেশ করেননি; বরং আট শ্রেণির লোক এই সম্পদের হক্বদার বলে উল্লেখ করেছেন (আত-তওবাহ, ৯/৬০)। অতএব যখন যেখানে যতজন হক্বদার থাকবে, তাদের হক্বের পরিমাণ বিবেচনা করে প্রদান করতে হবে। সবাইকে সমান দেওয়াও আবশ্যক নয়। প্রয়োজনে কোনো হক্বদারকে বাদ দিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া যেতে পারে।

ইবাদত→যিকির ও দু'আ

প্রশ্ন (২০) : 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার' ও 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আজাবান্নার' দু'আ দুটি সিজদায় পড়া যাবে কি?

-শাহাজান ফারুক
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, দু'আ দুটি সিজদায় পড়া যাবে। তবে 'রব্বানা আ-তিনা..... এর পূর্বে 'আল্লা-হুম্মা' শব্দটি যোগ করে বলবে। কেননা এটি কুরআনী দু'আ বা আয়াত। আর রুকূ-সিজদায় কুরআনী দু'আ পড়া জায়েয নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯; মিশকাত, হা/৮৭৩, নায়লুল আওতার, ৩/১০৯)। তবে শুরুতে 'আল্লাহুম্মা' যুক্ত করলে তখন দু'আটি হাদীছী দু'আ বলে গণ্য হবে এবং সিজদায় তা পড়া যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫২২)।

প্রশ্ন (২১) : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এই কালেমাকে যিকির হিসাবে পড়া যাবে কি?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : যিকিরের ক্ষেত্রে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে। কারণ যিকির শুধু আল্লাহর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হয় না। বরং তাঁর হয় আনুগত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (তিরমিযী, হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮০০; মুসতাদারাকে হাকেম, হা/১৮৩৪; শুআবুল ঈমান, হা/৪০৬১; ইবনু হিব্বান, হা/৮৪৬, সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪৯৭, সনদ হাসান; মিশকাত, হা/২৩০৬)। আর এ পর্যন্তই যে একটি পূর্ণ কালেমা (বা কালেমা তাইয়্যেবা) তা আরও একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র তালক্বীন দাও' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৬-১৭; মিশকাত, হা/১৬১৬)। মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোনো ইলাহ নেই), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (আবূ দাঊদ, হা/৩১১৬, ; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/১২৯৯; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৮৭; ছহীহ আল-জামে' আছ-ছগীর, হা/৬৪৮০)।

প্রশ্ন (২২) : অনেকেই বলেন, হজ্জের সময় আরাফার রাতে মুজদালিফায় যদি কেউ বান্দার হক্ব নষ্ট করার কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন, এমনকি বিনিময়ে তিনি তাকে আরো অনেক বেশি নেকী দিবেন। এ কথা কি সত্য?

-আব্দুর রহীম
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : না এমন পাপ ক্ষমা হবে না। কারণ পাপ দুই প্রকার। ১. আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ ও ২. বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ। আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। তবে বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ বান্দা ক্ষমা না করে। যেমন, ঋণের পাপ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৬; মিশকাত, হা/২৯১২)। আরাফার ময়দানে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত সকল পাপ চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কেননা আল্লাহ তাআলা এই দিনে সবচেয়ে বেশি মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫৪)। কিন্তু বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ বান্দার কাছেই ক্ষমা নিতে হবে। বান্দা যদি ক্ষমা করে, তাহলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন (কুরতুবী, ১৮/২০)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ চেয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দ্বীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট হতে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯; মিশকাত, হা/৫১২৬)।

প্রশ্ন (২৩) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে 'দরূদে ইবরাহীম' ব্যতীত অন্য কোনো দরূদ আছে কি?

-রাশিদুল ইসলাম আওলাদ
হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দরূদ হলো, 'দরূদে ইবরাহীম' যা বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ হয়েছে। আর এ দরূদটিই পড়া উচিত। যেমন, (১) أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- أَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. **উচ্চারণ :** আল্লা-হুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৬; মিশকাত, হা/৯১৯)। (২) اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ **উচ্চারণ :** 'আল্লা-হুম্মা ছল্লি আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আযওয়া-জিহী ওয়া যুররিইয়্যাতিহী, কামা- ছল্লায়তা আলা- আ-লি ইবরহীমা, ওয়াবা-রিক আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আযওয়া-জিহী ওয়া যুররিইয়্যাতিহী কামা- বা-রকতা আলা- আ-লি ইবরহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৬৯; আবুদাঊদ, হা/৯৭৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৬১)। তবে অন্যভাবেও দরূদ দেখা যায়। যেমন, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ **উচ্চারণ :** ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮)। ছাহাবীগণ নবীর নাম উল্লেখ করলে এ শব্দ/বাক্য ব্যবহার করতেন। তবে ছালাতের মধ্যে 'দরূদে ইবরাহীম'-ই পড়তে হবে।

প্রশ্ন (২৪) : সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য যিকির ও দু'আসমূহ আমল করার জন্য নির্ধারিত সময় কতক্ষণ?

-আব্দুর রহমান
রামনগর, দিনাজপুর।

উত্তর : না, এজন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহে কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনি আপনার প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় আপন মনে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে স্মরণ করুন, উচ্চ শব্দে নয়' (আল-আ'রাফ, ৭/২০৫)। তবে বিভিন্ন হাদীছের বর্ণনালোকে বলা যায় যে, 'সুবহা-নাল্ল-হী ওয়া বিহামদিহী' দু'আটি একশতবার পড়তে যত সময় লাগে বা তার চেয়েও অধিক সময়ব্যাপী সকাল-সন্ধ্যায় দু'আ পাঠ করা যায়। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশতবার 'সুবহা-নাল্ল-হী ওয়া বিহামদিহী' বলবে কিয়ামতের দিন এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এই বাক্য উক্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিকবার বলবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯২, তিরমিযী, হা/৩৪৬৯; আহমাদ, হা/৮৮৫৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৬৫৩, ছহীহ আল-জামে', হা/৬৪২৫; মিশকাত, হা/২২৯৭)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি একশতবার উক্ত বাক্য বলবে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বেশি হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯১; মিশকাত, হা/২২৯৬)। উল্লেখ্য যে, সন্ধ্যার যিকিরের সময় হলো সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত, সূর্যাস্তের পরে নয়।

প্রশ্ন (২৫) : জনৈক আলেম বলেছেন, কয়েকজন মিলে ৪,৪৪৪ বার দরূদে নারিয়া পাঠ করা অনেক ফযীলতের কাজ। এ কথার শারঈ কোনো ভিত্তি আছে কি?

-মারুফ হোসেন
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এমন দরূদ ও তার ফযীলতের শারঈ কোনো ভিত্তি নেই; বরং তা মিথ্যা ও বানোয়াট। শায়খ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দরূদে নারিয়া' কী জিনিস তা আমি জানি না। তবে দরূদটি যদি ঐ দরূদ এবং তার অনুকূলে হয় যা রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। মানুষ দরূদ পাঠ করবে সেভাবে যেভাবে রাসূল ﷺ ফরয এবং নফল ছালাতে পাঠ করেছেন। যদি ঐ দরূদে অতিরিক্ত গুণ বর্ণনা করা হয় যা রাসূল ﷺ করেননি অথবা উম্মতের জন্য বিধান করেননি, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (২৬) : বিচার দিবসে সূরা মুলকের সুপারিশ পাওয়ার জন্য সেটা কি প্রতিদিন রাতে শুধু ঘুমানোর সময়ই পড়তে হবে না-কি রাতের যে কোনো সময়ই পড়া যাবে?

-আব্দুর রহমান
রামনগর, দিনাজপুর।

উত্তর : সূরা মুলক প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে তেলাওয়াত করাই উত্তম। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা

সিজদা ও মুলক না পড়ে নিদ্রা যেতেন না (তিরমিযী, হা/২৮৯২; দারেমী, হা/৩৪১১, সনদ ছহীহ; মিশকাত, হা/২১৫৫)। তবে সূরা মুলকের মাধ্যমে কবরের শাস্তি হবে না- মর্মে যখন সূরাটি পড়ার কথা এসেছে, তখন রাতের কথা এসেছে (তিরমিযী, হা/২৮৯০; মিশকাত, হা/২১৫৪; উল্লেখ্য যে, হাদীছটির প্রথমাংশ যঈফ)। তবে যতক্ষণ ক্ষমা না হবে, ততক্ষণ সূরা মুলক সুপারিশ করতে থাকবে- মর্মে যখন হাদীছ এসেছে, তখন সময়ের কথা উল্লেখ হয়নি (তিরমিযী, হা/২৮৯১; মিশকাত, হা/২১৫৩)।

প্রশ্ন (২৭) : কারো সালামের জওয়াব দিয়ে পুনরায় কি তাকে সালাম দেওয়া যাবে? বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদেরকে যেমনটি করতে দেখা যায়।

-ফযলে মাহমুদ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেয়াই জরুরী। তবে উত্তর দিয়ে আবার সালাম দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। বরং এ আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে এমন কিছুর নবউদ্ভাবন করল, যে ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মিশকাত, হা/১৪০)।

ইবাদত→ মসজিদ-মুছল্লা

প্রশ্ন (২৮) : মসজিদের সামনে কবর। কিন্তু উভয়ের মাঝে কোনো প্রাচীর নেই। এখন করণীয় কী?

-আব্দুল্লাহ আল-আমীন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় উভয়ের মাঝে প্রাচীর দিয়ে কবরস্থানকে মসজিদ থেকে আলাদা করতে হবে। কেননা মসজিদের সামনে কবর থাকলে ছালাত পড়া যাবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা কবরের উপরে বসো না এবং সেখানে ছালাত আদায় করো না (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২; মিশকাত, হা/১৬৯৮)। এমনকি পাশে কবর থাকলেও ছালাত হবে না (মুসনাদে বাযযার, হা/৪৪১, ৪৪২; আহকামুল জানায়িয, হা/২৭০)। উল্লেখ্য যে, মসজিদের সামনের কবর যদি মসজিদের পরে হয় তাহলে তা উঠিয়ে কবরস্থানে বা অন্য কোথাও স্থানান্তর করতে হবে (ফাতাওয়া নূরে আলাদ্দারব লি ইবনি উছায়মীন, ইজতিনাবুন নাজাসাত, ১৭/১২৯)। আর না হলে মসজিদ ও কবরের মাঝখানে প্রাচীর দিয়ে কবর ও মসজিদের মধ্যে ব্যবধান করলে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে (ফাতাওয়া আল-মুনাজ্জিদ, পৃ. ৩)।

প্রশ্ন (২৯) : কবুতর পোষার জন্য মসজিদের ছাদের উপর ছোট ঘর নির্মাণ করা যাবে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস
রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : কবুতর পোষার জন্য মসজিদের ছাদের উপর ঘর নির্মাণ করা যাবে না। কারণ কবুতর উপরে থাকলে মসজিদ অপরিষ্কার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে ও তা পরিষ্কার রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহল্লায় মসজিদ গড়ে তোলার, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ও এতে সুগন্ধি ছড়াবার হুকুম দিয়েছেন (আবূ দাঊদ, হা/৪৫৫; তিরমিযী, হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ, হা/৭৫৮)। জনৈক ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করলে রাসূলুল্লাহ তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৯৩)। তাছাড়া দুনিয়াবী কোনো কাজে কিংবা ব্যক্তি স্বার্থে মসজিদকে ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাছাড়া এটা মসজিদের আদবের খেলাফ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনের জন্য...' (আল-জিন, ৭২/১৮)।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৩০) : কবরস্থানে গাছ লাগানো ও তা কাটা যাবে কি?

-রবিউল ইসলাম
বোদা, পঞ্চগড়।

উত্তর : কবরস্থানের যে অংশে কবর রয়েছে সেখানে ফসলাদী আবাদ করা ও গাছ লাগানো ঠিক নয়। বরং কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ সেখান থেকে দূর করা উচিত। কেননা কবরস্থানে গাছগাছালি থাকলে মানুষ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সেখানে যাতায়াত করবে। ফলে কবরস্থানের মান-মর্যাদা রক্ষা করা যাবে না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরস্থানের উপর বসতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২; মিশকাত, হা/১৬৯৮)। তবে যে স্থানে কবর হয়নি অথবা কবর থাকার কোনো চিহ্নও পাওয়া যায় না, এমন জায়গায় কবরস্থানের উন্নতির জন্য আবাদ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩১) : কবরে মাটি দেওয়ার সময় কি শুধু ডান হাত দিয়ে দিতে হবে? নাকি উভয় হাত দিয়ে দেওয়া যাবে?

-আব্দুল্লাহ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : উভয় হাত দিয়েই কবরে মাটি দেওয়া সুন্নাত। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

একবার একটি জানাযার ছালাত আদায় করালেন। তারপর তিনি তার কবরের কাছে এলেন এবং কবরে তার মাথা বরাবর তিন অঞ্জলি মাটি রাখলেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৬৫; মিশকাত, হা/১৭২০)।

প্রশ্ন (৩২) : মৃত ব্যক্তিকে গালিগালাজ করা ও তার মন্দ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : মানুষ মারা যাওয়ার পর সে তার কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে যায়, বিধায় তাকে গালিগালাজ করা কিংবা তার দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা জায়েয নয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের কাছে পৌঁছে গেছে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৩; মিশকাত, হা/১৬৬৪)। তবে মৃত ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কারও মাল আত্মসাৎ করে থাকে বা কোনো মানুষের অধিকার নষ্ট করে থাকে, তাহলে সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার স্বার্থে তার কৃত অন্যায়ের কথা প্রকাশ করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ লাশকে সামনে রেখে তার ঋণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২২৮৯; মিশকাত, হা/২৯০৯)।

হাদীছ→তাহক্বীক্ব

প্রশ্ন (৩৩) : ইমাম ত্বহাবী তার 'শারহু মুশকিলুল আছার' গ্রন্থে 'সুরাইয়া' নামক একটি তারকা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যার মূল কথা হলো, উক্ত তারকাটি উদয় হলে মানুষের উপর থেকে রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-হৃদয় সরকার
দিনাজপুর।

উত্তর : এই মর্মে বর্ণিত হাদীছটি দুর্বল (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১/৪৩; মাউসূআতু আত্বরাফীল হাদীছ, ১/৬০১১৫)।

পারিবারিক বিধান→সম্পর্ক

প্রশ্ন (৩৪) : শারঈ কোনো কারণ ছাড়া স্বামীর কথায় মা-বাবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে কি?

-তামান্না
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : না, শারঈ কোনো কারণ ছাড়া স্বামীর কথায় পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা মহাপাপের কাজ। যা করতে নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন ও বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৫; আবূ দাঊদ, হা/১৬৯৬; তিরমিযী, হা/১৯০৯; মিশকাত, হা/৪৯৪২)। তাছাড়া স্ত্রী কোনো পাপের কাজের ক্ষেত্রে স্বামীর নির্দেশ পালন করতে বাধ্য নয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনছারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করাই। তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না, তা করো না। কারণ আল্লাহ তাআলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে (ছহীহ বুখারী, হা/৫২০৫)। তবে আল্লাহর নাফরমানী না হলে এমন সময় পিতা-মাতা কষ্ট পেলেও স্বামীর কথাই মেনে চলতে হবে (তিরমিযী, হা/১১৫৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৫৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪১৬১; মিশকাত, হা/৩২৫৫)।

পারিবারিক বিধান→বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (৩৫) : স্বামী মারা যাওয়ার পর দেবরকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : স্বামী মারা যাওয়ার পর দেবরকে বিবাহ করতে পারে। কারণ যে ১৪ জন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম ভাবী তার অন্তর্ভুক্ত নয় (আন-নিসা, ৪/২৩)। তবে অবশ্যই উক্ত মহিলাকে শোক পালনের জন্য শরীআত নির্ধারিত সময় তথা ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। (আল-বাক্বারা, ২/২৩৪; ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৩৪-৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮৬, মিশকাত, হা/৩৩৩০)।

প্রশ্ন (৩৬) : তিন বছর আগে মেয়ের পরিবারের অমতে আমাদের বিবাহ হয় এবং একটি সন্তানও হয়েছে। তবে বর্তমানে উভয়ের পরিবার তা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বের বিবাহ বহাল থাকবে নাকি নতুন করে বিবাহ পড়াতে হবে ও মোহর নির্ধারণ করতে হবে? আর সন্তানটির ব্যাপারে হুকুম কী?

-রবিউল ইসলাম
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : বিবাহ ছহীহ হওয়ার জন্য মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি আবশ্যক। যদি কেউ মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মেয়েকে বিবাহ করে, তাহলে সে বিবাহ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নারীকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়নি তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭৯; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২)। যেহেতু মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয় সেহেতু যদি কেউ উক্ত বিবাহের উপর ভিত্তি করে সংসার করে, তাহলে তা যেনা হিসাবে বিবেচিত হবে। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যদি ঘটেই যায় তাহলে অবিভাবকের উচিত তাদেরকে মেনে নিয়ে নতুনভাবে বিবাহ পড়ানো। প্রশ্নোল্লিখিত পরিস্থিতিতে যেহেতু বিবাহ হয়নি, তাই নতুনভাবে মোহর নির্ধারণ করে অবিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে নতুনভাবে বিবাহ পড়াতে হবে এবং উক্ত সন্তান অবৈধ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন (৩৭) : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ১৫ বছর পূর্বে এক তালাক দিয়ে ঘর-সংসার করতে থাকে। তার ৮ বছর পরে আবার এক তালাক দেয়। বর্তমানে তাকে তৃতীয়বারের মতো আবার তালাক দেয়। কিন্তু তারা পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে জনৈক আলেম তাদেরকে নতুন বিয়ে করার জন্য ফতওয়া দেন। এ বিয়ে কি ইসলাম সমর্থন করে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : তৃতীয় তালাক দেওয়ার পর উক্ত স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার সুযোগ থাকে না। তবে কোনো প্রকার পূর্ব চুক্তি ছাড়াই যদি উক্ত মহিলার অন্য কারো সাথে বিয়ে হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে আবার প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘(ফেরতযোগ্য) তালাক হলো দু’বার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। ...তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনো স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোনো পাপ নেই’ (আল-বাক্বারা, ২/২২৯-২৩০)।

প্রশ্ন (৩৮) : উভয়ের অভিভাবকের অজান্তে কাজী অফিসে দুজন অপরিচিত সাক্ষীর মাধ্যমে ছেলে-মেয়ের বিবাহ হয়। একটি সন্তান হওয়ার পরে ছেলে মেয়েকে প্রথমে এক তালাক দেয় এবং তারপর কিছুদিন ঘর-সংসার করার পরে আবার একসাথে দুই তালাক দেয়। উক্ত বিবাহ ও তালাক কি বৈধ হবে? যদি না হয় তাহলে ঐ সন্তানটির ব্যাপারে করণীয় কী?

-শেখ মানিক হোসেন
মানিকদিয়া, মেহেরপুর।

উত্তর : প্রথমত, উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি। সুতরাং তালাক কার্যকর হওয়ার প্রশ্নেই আসে না। কেননা মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ কার্যকর হয় না। যেহেতু প্রশ্নোল্লিখিত বিবাহটি অবিভাবকের অজান্তে হয়েছে তাই উক্ত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল’ (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)। এখানে তারা উভয়েই শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থলাভিষিক্ত। তবে এ মহাপাপের জন্য তাদেরকে তওবা করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের উক্ত সন্তান জারজ সন্তান বলে গণ্য হবে এবং সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। তবে মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩/৩৭২)। মাতৃ পরিচয় নিয়ে মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে (ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমা, ২০/৩৮৭)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি স্বাধীন মহিলার সাথে যেনা করলে এবং অবৈধভাবে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তান নিজেও উত্তরাধিকারী হবে না এবং ঐ সন্তানের সম্পদেও (মা ব্যতীত) অন্য কেউ উত্তরাধিকারী হবে না’ (তিরমিযী, হা/২১১৩; মিশকাত, হা/৩০৫৪)।

পারিবারিক বিধান→আক্বীক্বা

প্রশ্ন (৩৯) : জনৈক ব্যক্তি তার পূর্ব নিয়ত অনুযায়ী সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে গরু যবেহ করে আক্বীক্বা দিয়েছেন। এটা কি শরীআত সম্মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখন করণীয় কী?

-হাবিবুর রহমান
ময়মনসিংহ সদর।

উত্তর : না, উক্ত আক্বীক্বা শরীআত সম্মত হয়নি। কেননা গরু দিয়ে আক্বীক্বা করা যাবে না। বরং ছাগল তথা খাসী বা বকরী দিয়ে আক্বীক্বা করাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘ছাগ হোক বা ছাগী হোক, ছেলের পক্ষ থেকে দুটি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি আক্বীক্বা দিতে হয়’ (নাসাঈ, হা/৪২১৮; তিরমিযী, হা/১৫১৬; আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৫; মিশকাত, হা/৪১৫২, ৪১৫৬; ইরওয়া, হা/১১৬৬)।

ত্বাবারানীতে উট, গরু বা ছাগল দিয়ে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে যে হাদীছ এসেছে, তা মাওযূ' অর্থাৎ জাল (আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৬৮)। তাছাড়া এ বিষয়ে রাসূল ﷺ ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো আমল নেই। গরু দিয়ে কোনো ব্যক্তির আক্বীক্বা করা হয়ে থাকলে বর্তমানে তাকে আর নতুন করে আক্বীক্বা করা লাগবে না। কেননা জন্মের সপ্তম দিনের পরে আক্বীক্বা চলে না। ৭ দিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার ব্যাপারে বায়হাক্বী, ত্বাবারানী, হাকেমে বুরায়দা ও আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বর্ণিত হাদীছকে শায়খ আলবানী 'যঈফ' বলেছেন (ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৭০)। জীবনে একদিন হলেও আক্বীক্বা দিতে হবে মর্মে বর্ণনাটিও সঠিক নয় (আল্লামা ছানআনী, সুবুলুস সালাম, ৪/৯৭)।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৪০) : এফিলিয়েইট মার্কেটিং বৈধ কি?

-মনিরুযযামান শুভ
দিনাজপুর সদর।

উত্তর : এফিলিয়েইট মার্কেটিংকে অনেকে এ্যাসোসিয়েট মার্কেটিং, আবার কেউবা রেফারেল মার্কেটিং বলে থাকেন। বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে এই প্রকার মার্কেটিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই মার্কেটিংয়ের সারমর্ম হচ্ছে SOPS বা Selling Other People's Stuff. (অন্যের পণ্য বিক্রয় করা বা দালালী করা) অর্থাৎ এফিলিয়েইট তার সাইটে বিক্রেতার সাইট বা পণ্যের লিংক প্রদান করে থাকে। ক্রেতা বা কাস্টমার সেই লিংকে ক্লিক করে সহজেই বিক্রেতার সাইটে চলে যায় এবং পণ্য ক্রয় করে। বিনিময়ে বিক্রেতা এফিলিয়েইট সাইটকে শতকরা কিছু টাকা বা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা (কমিশন) প্রদান করে। এ সকল পদ্ধতিতে কমিশন বা বেতন অনির্দিষ্ট বা অনিশ্চত। উক্ত ব্যবসার কিছু পদ্ধতি জায়েয হলেও বেশির ভাগ স্থানে তা ইসলমী অর্থনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং তাতে ধোঁকা ও হারামে পতিত হওয়ার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। পদ্ধতিভেদে শরীআতের বিভিন্ন বিধান রয়েছে যা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। তবে নিম্নে তার মৌলিক কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো যা উক্ত পদ্ধতিগুলোর সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১. মূল সাইটে হালাল-হারাম অনেক পণ্য থাকে, কেউ নিজ সাইটে হালাল পণ্যের লিংক রেফার করলেও দ্বিতীয়জনের কাছে হারাম পণ্যের লিংক চলে যায়। তাই হারামের পথ দেখানোর কারণে সে ক্রেতার সমান পাপী হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৭; সুনানে দারেমী, হা/৫২১)। ২. বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় (মুসলিম, হা/১৬০৫; ইবনে মাজাহ, হা/২১৫৫; মিশকাত, হা/২৮৯২)। ৩. হারামে নিপতিত হওয়ার সন্দেহ। ইসলাম সন্দেহযুক্ত বিষয়কে সমর্থন করে না। (তিরমিযী, হা/২৫১৮; মিশকাত, হা/২৭৭৩)। ৪. শ্রমবিহীন বিনিময় এবং বিনিময়বিহীন শ্রম, যা ইসলামী আইন বহির্ভূত।

প্রশ্ন (৪১) : আমি কম্পিউটারের দোকানে কাজ করি। যারা পাসপোর্ট বা স্ট্যাম্প সাইজের ছবি প্রিন্ট করে নিতে চায় তাদেরকে সেটা প্রিন্ট করে দেওয়া কি বৈধ হবে?

-ফাইযুল ইসলাম
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : ছবি অঙ্কন করা, বিনা প্রয়োজনে ছবি প্রিন্ট করা, স্মৃতিস্বরূপ অ্যালবামে কিংবা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা চরম গর্হিত পাপ। ক্বিয়ামতের দিন এদেরকে কঠিনতর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, একদা নবী ﷺ আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। ঐ সময় ঘরে একটি পর্দা ঝুলানো ছিল, তাতে কিছু চিত্র অঙ্কিত ছিল। এটা দেখে রাগে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর পর্দাটি টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে ঐ সকল লোকেরা, যারা এই চিত্রগুলো অঙ্কন করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৭)। তবে যেসব ক্ষেত্রে ছবি তোলা একান্ত জরুরী, সেসব ক্ষেত্রে ছবির উপরে কোনো প্রকার এডিটিং না করে ছবি প্রিন্ট করলে পাপ হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আর তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তবে যেসব ক্ষেত্রে তোমরা নিরুপায়, তা ব্যতীত' (আল-আনআম, ৬/১১৯)। তবে রূযী উপার্জনের জন্য এ মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা ভালো (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৩৩২)। কেননা যা পছন্দনীয় নয় ও দৃষ্টিকটু তা পরিহার করাই উচিত।

প্রশ্ন (৪২) : আমি কম্পিউটারের ব্যবসা করতাম, আর অডিও ও ভিডিও গান এবং ছায়াছবি দিয়ে মেমোরিতে লোড করতাম। পরে এ ব্যবসা করা হারাম জানতে পেরে তা ছেড়ে দিয়েছি। তবে ঐ ব্যবসার টাকা দিয়ে যে পরিধেয় জামা, কাপড়সহ নানা বস্তু ক্রয় করেছিলাম তাও কি পরিহার করতে হবে?

-রাকিব হাসান
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : হারাম উপার্জন দিয়ে ক্রয়কৃত খাদ্য-খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদ শরীরে থাকলে কোনো ইবাদত কবুল হয় না (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ যদি 'হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের পাওনা' না হয় তাহলে আল্লাহর কাছে খালেছ অন্তরে তওবা করলে এবং পুনরায় সেই পাপে ফিরে না যাওয়ার অঙ্গীকার করলে উক্ত সম্পদ দিয়ে ক্রয়কৃত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহার করা জরুরী নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তাহলে পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তারই থাকবে এবং তার বিষয়টি আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। পক্ষান্তরে যারা পুনরায় সূদের কারবারে ফিরে যাবে, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪৩) : মোবাইল বা অনলাইনে যে কোনো ধরনের গেমস খেলা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : না, খেলা যাবে না। কেননা এতে যথেষ্ট সময় অপচয় হয়। আর যে খেলায় সময়ের অপচয় হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না এবং আল্লাহর যিকির ও ছালাত হতে বিরত রাখে তা হারাম (আল-মায়িদাহ, ৫/৯১; ফাতাওয়া সওয়াল ওয়া জওয়াব, ১/১৩৬৬)। আর মোবাইলে গেম খেলাও এমনি, কাজেই তা অবৈধ। বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবা (পাশা/শতরঞ্জ) খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-গোশত দ্বারা রঞ্জিত করল (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬০; মিশকাত, হা/৪৫০০)। তাছাড়া তিনটি খেলা ছাড়া সকল প্রকারের খেলা যা লোকেরা খেলে থাকে তা অন্যায় ও বাতিল। ১. ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা। ২. ঘোড়ার প্রশিক্ষণ ও ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। এগুলো শরীআতে বৈধ ও স্বীকৃত (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৩৩৮; দারেমী, হা/২৪০৫ তিরমিযী, হা/১৮৩৭; ইবনু মাজাহ, হা/২৮১১; মিশকাত, হা/৩৮৭২)।

প্রশ্ন (৪৪) : শরীরের কোনো স্থানে কেটে গেলে সেই ক্ষত স্থানের রক্ত কি খাওয়া যাবে?

-শাকিব হোসাইন
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : না, শরীরের ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত পান করা যাবে না। কেননা তা পান করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে....' (আল-মায়েদাহ, ৫/৩; আল-বাক্বারা, ২/১৭৩)।

প্রশ্ন (৪৫) : ছাদাক্বার মাল গ্রহণকারী কোনো অভাবী ব্যক্তি যদি তার বিবাহে উক্ত মাল থেকে খরচ করে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করে তাহলে কি ধনী ব্যক্তিরা তা খেতে পারবে?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এমতাবস্থায় খেতে পারে। কেননা ছাদাক্বার মালের স্থান পরিবর্তন হলে হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখন চুলায় একটি পাতিলে গোশত রান্না হচ্ছিল। অতঃপর তার সামনে রুটি ও বাড়িতে থাকা তরকারি পরিবেশন করা হলো। তখন তিনি বললেন, গোশতের পাতিল দেখছি না যে? বলা হলো, এগুলো বারীরাকে ছাদাক্বা করা হয়েছে। আর আপনি তো ছাদাক্বা খান না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'এটা তার জন্য ছাদাক্বা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৪)। তাই ছাদাক্বার মাল নিয়ে বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে সেই অনুষ্ঠানে ধনীদের খেতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৪৬) : আমি পেশায় একজন নার্স। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো রোগী আমার প্রতি খুশি হয়ে ২০০/১০০ টাকা হাদিয়া দেন। আবার কখনো খাবারও খেতে দেন। এটা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

-সালমা খাতুন
অভয়নগর, যশোর।

উত্তর : উক্ত পেশা যদি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তা হয় তাহলে কিছুই গ্রহণ করা যাবে না ও খাওয়া যাবে না। আবূ হুমায়দ আস-সাঈদী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযদ গোত্রের ইবনুল লুতবিয়্যা নামক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হলে যাকাত উসূল করে মদীনায় ফিরে এসে সে বলল, এ পরিমাণ সম্পদ তোমাদের আর এ পরিমাণ সম্পদ হাদিয়া হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের উদ্দেশে হামদ ও ছানা পড়ে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন,

তোমাদের কাউকে আমি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বে নিয়োগ দেই। আরম এসে সে বলে, এটা তোমাদের জন্য, আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তো সে ব্যক্তি তার পিতা অথবা মাতার বাড়িতে বসে রইল না কেন? তখন সে দেখত কেউ তাকে তার বাড়িতেই তুহফা পৌঁছে দিয়ে যেত কিনা? (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩২; আবূ দাঊদ, হা/২৯৪৬; মিশকাত, হা/১৭৭৯)।

প্রশ্ন (৪৭) : আমেরিকা ও কানাডার অনেক প্রবাসী ড্রাইভার তাদের গাড়ীর গ্যারান্টির মেয়াদ ঠিক রাখার জন্য কিছুদিন পরপর মাইলেজ কমিয়ে দেন। কেননা এ সকল দেশে পাঁচ বছরের মধ্যে যদি গাড়ীর মাইলেজ ৬০,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে তাহলে উক্ত গ্যারান্টির মেয়াদ বাতিল হয়ে যায়। তাই গাড়ীর মাইলেজ ৮০,০০০ কিলোমিটার হয়ে থাকলে তা কমিয়ে দিয়ে ৪০,০০০ কিলোমিটার করে থাকেন। এভাবে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের উপার্জন কি বৈধ হবে?

-হোসাইন
কুইবেক, কানাডা।

উত্তর : না, উক্ত উপার্জন বৈধ হবে না। কেননা এভাবে গাড়ীর মাইলেজ কমিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা এক প্রকার চুরি ও প্রতারণা, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'আর যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪; মিশকাত, হা/৩৫২০)।

হালাল-হারাম→পোশাক

প্রশ্ন (৪৮) : পুরুষের জন্য লাল ও হলুদ রঙের কাপড়, টুপি ও পাগড়ি পরিধানের বিধান কী?

-হাসিবুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : পোশাকের বিষয়ে মূলনীতি হলো নারীর জন্য সকল রঙের পোশাক জায়েয। কিন্তু পুরুষের বিষয়ে কিছু কিছু রঙের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যথা- ১. লাল রং। ২. উসফুর রং মিশ্রিত কাপড়, যা কিছুটা হলুদ রঙের নিকটবর্তী। ৩. যাফরান রং মিশ্রিত। তন্মধ্যে লাল রঙের বিষয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হুকুম হলো, অমিশ্রিত নিছক লাল রঙের পোশাক পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম, কেননা তাতে নারী ও অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৬; আবূ দাঊদ হা/৩৫৭৪; নাসাঈ, হা/৫২৮৩)। একদা নবী ﷺ-এর নিকটে দুটি লাল রঙের কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি আসলো এবং সালাম দিল, কিন্তু নবী ﷺ তার সালামের উত্তর দিলেন না (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৭৪, তিরমিযী, হা/২৭৩১)। তবে যদি অন্য রঙের সাথে লাল রং মিশ্রিত হয়, তাহলে তা পরিধান করা বৈধ হবে (ছহীহ বুখারী হা/৫৪০০; ছহীহ মুসলিম হা/৪৩০৮)।

উসফুর রং যেহেতু হলদেটে হয় সেহেতু হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। যাফরান রং মিশ্রিত কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত রংগুলো ব্যতীত সাদা, কালো, সবুজসহ সকল রঙের পোশাক পুরুষের জন্য বৈধ।

অপরাধ-দণ্ডবিধি

প্রশ্ন (৪৯) : উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক ছেলেকে মদ পানের অপরাধে ৫০ বেত্রাঘাত করেন। এরপর ছেলেটি মারা গেলে বাকি ৩০ বেত্রাঘাত তার কবরে মারেন। এ ঘটনার কোনো দলীল আছে কি?

-মোহাম্মদ সায়েম
গাইবান্ধা সদর।

উত্তর : উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক ছেলেকে মদ পানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। তবে, ৫০টি বেত মারার কারণে মারা গেলে মৃত্যুর পর কবরে ৩০টি বেত্রাঘাত করেছিলেন একথা মিথ্যা (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/১৭৯৫৩; জামেউল আহাদীছ, হা/৩০২৪৮; কানযুল উম্মাল, হা/৩৬০১৪; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/১৭০৪৭)।

ইতিহাস-যুদ্ধ-জিহাদ

প্রশ্ন (৫০) : 'শহীদী মৃত্যুযন্ত্রণা না-কি শরীরে চিমটি কাটার চেয়েও কম কষ্টের'-কথাটি কি সঠিক?

-সাঈদ হোসেন
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হ্যাঁ, কথাটি সঠিক। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর কষ্ট ততটুকু অনুভব করে, তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে' (নাসাঈ, হা/৩১৬১; দারামী, হা/২৪৭৫; তিরমিযী, হা/১৬৬৮, ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান গারীব বলেছেন)।

মাসিক আল-ইতিছাম প্রশ্ন জমাদানের জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল : ০১৭০৯-৭৯৬৪৩৮
ইমেইল : monthlyalitisam@gmail.com
ওয়েব : al-itisam.com
ডাক যোগাযোগ : সম্পাদক, মাসিক আল-ইতিছাম
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund
Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund
Account No: 20501130204367802

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund
Account No: 20501130204367600

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund
Account No: 20501130204367903

বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

www.al-itisam.com

Monthly Al-Itisam الاعتصام 5th Year, 3rd Part, January 2021, Price : 25.00

৫ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্স ২০২১

তারিখ : ৪ ও ৫ মার্চ
রোজ : বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান : হাটাব-বীরহাটাব, রুপগঞ্জ, নারয়ণগঞ্জ।
সময় : ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু।

সভাপতি :

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন;
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী ও দিনাজপুর।

বক্তব্য পেশ করবেন :

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ